সচিত্রকরণ : অশোক কর্মকার

আনিসুল হক

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

কশা চলছে। রাস্তা অসমান। টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে। একটু একটু ঝাঁকি লাগছে। শেখ মুজিবের সেই দিকে খেয়াল নাই। তিনি দেখছেন, পুরো ঢাকা শহর—মোগলটুলি থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল—পুরো পৃথিবী চাঁদের আলোয় ডুবে আছে। রেসকোর্স ময়দান, রমনার গাছগাছালি, গভর্নর হাউস, ঢাকা ক্লাব, আর অ্যাসেম্বলি ভবন—সবকিছুকেই নিমগ্ন করল এই চাঁদের আলো।

শেখ মুজিবের উদাস উদাস লাগে। রিকশা হলের সামনে আসে। তিনি রিকশাওয়ালার হাতে একটা আধুলি দিয়ে ফিরে না তাকিয়ে হাঁটতে থাকেন। রিকশাওয়ালা ভাঙতি পয়সা বের করে দেখে সাহেব অনেক দূরে চলে গেছেন।

এটা কি একটা হল, নাকি কোনো স্বপ্নমহল!

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলটি খুবই সুন্দর। স্যার আর এন মুখার্জি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতেন, মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি এই হলটির স্থাপত্য নকশা ও নির্মাণকাজ সমাধা করেছে। মাথার ওপরে মায়াবী রঙের বড় বড় মিনার, লম্বা বারান্দায় সুদৃশ্য খিলান, সামনে টেনিস খেলার তিনটা লন। এর চেয়ে সুন্দর ভবন ঢাকায় আর আছে কি না সন্দেহ। কার্জন হল, কিংবা হাইকোর্ট ভবনও এত দৃষ্টিনন্দন নয়।

চাঁদের আলোয় বিভ্রান্ত শেখ মুজিবের প্রত্যয় হয়!

১৬ নম্বর রুমটির দিকে হাঁটেন শেখ মুজিব।

বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজের স্যান্ডেলের আওয়াজ লম্বা করিডর বেয়ে দূরে দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে শেখ মুজিবের কানে।

আস্তে করে রুমের দরজা ঠেললেন মুজিব।

গাজীউল হক শুয়ে আছেন তাঁর বিছানায়।

পাশের বিছানাটা আলী আশরাফের। তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন। এই সুযোগে সেই বিছানায় রাত্রি যাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিবের হাতে একটা ওষুধের শিশি। ড. করিম এই ওষুধ তাঁকে দিয়েছেন। মুজিবের শোয়া-খাওয়া কোনো কিছুর স্থিরতা নাই। এর ফলটা দাঁড়িয়েছে, ইদানীং কনুইয়ের উল্টো দিকে, হাঁটুর নিচে ভীষণ চুলকায়। এই ওষুধটা লাগাতে বলেছেন ডাক্তার সাহেব।

রুমে ঢুকে ওষুধের শিশিটা নিয়ে তিনি বিছানার দিকে তাকিয়ে আবার বিভ্রান্ত বোধ করেন।

খোলা জানালা দিয়ে একটা চারকোনা আলো এসে পড়েছে আলী আশরাফের বিছানায়। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, মোগলটুলি থেকে যে চাঁদটা তাঁকে অনুসরণ করে আসছে, সে ঠিকই বিড়ালের মতো চুপি চুপি এসে তাঁর বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।

'মুজিব ভাই, আসলেন?' গাজীউল বলেন।

'কী গাজী, তুমি ঘুমাও নাই?'

'না, মুজিব ভাই। আপনি বাতি জ্বালান।'

মুজিব এতক্ষণ বাতি জ্বালাচ্ছিলেন না, গাজী সেটা লক্ষ করেছেন।

মুজিব বললেন, 'সারা দিন পরিশ্রম করো, ক্লাস করো, আবার মিটিং-মিছিলও করো, তোমার তো ঘুমানো দরকার।'

গাজী বললেন, 'আপনার তুলনায় আমার পরিশ্রম কোনো পরিশ্রমই না, মুজিব ভাই। সকাল থেকে শুরু করেন মিছিল-মিটিং। কোথায় শোন, কোথায় ঘুমান, কী খান না খান, কোনো কিছুর ঠিক নাই। এখন একটু ভালো বিছানা পাইছেন। আপনি একটু শান্তিমতো ঘুমান। আপনার শরীরের অবস্থা তো ভালো না।'

'আরে মিয়া ঘুম হয় নাকি। দেখো না কী রকম চুলকানি হয়েছে!'

'চুলকানির ওষুধ দিছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারের কাছে গেছলাম। সেখান থেকে আনলাম। এখন একটু ওষুধ লাগাই।'

মুজিব ওষুধের শিশির মুখটা **মোচড় দিয়ে খুললেন। আধা** তরল সাদা ওষুধটা হাতে নিয়ে যথাস্থানে **লাগালেন।**

শিশির মুখ খুললেন, যেন ভেতর **থেকে** বেরিয়ে এল আলাউদ্দিনের ভয়ংকর এক দৈত্য, যে দৈত্যের নাম দুর্গন্ধ।

'বাপ রে, কী গন্ধ! কুইনিন জ্বর সারাবে, তবে কুইনিন সারাবে কে?' মুজিব বললেন।

গাজী নাকের কাছে একটা কাঁথা ধরলেন। সত্যি ভীষণ বদগন্ধ।

মুজিব বাইরের কাপড় ছাড়ার জন্য লুঙ্গি হাতে নেন।

তারপর আবার বাতির সুইচটা **টিপে ঘরটা অন্ধকার করেন।**

আবারও একটা চারকোনা **জ্যোৎস্নাখণ্ড অধিকার করে** নেয় জানালার ধারের শূন্য বিছানাটি।

মুজিব ডাকেন, 'গাজী, এই দিকে আসো।'

গাজীউল বুঝতে পারেন না ঠিক কোথায় যেতে বলা হচ্ছে।

'আসো না। আমার কাছে আসো। একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

'কী জিনিস?'

'আমার বিছানায় এসে বসো। আইলেই কেবল দেখা যাবে। আসো।'

গাজীউল কাছে গেলেন মুজিবের। **রাসায়নিকের গন্ধটা** আবার একটা ধাক্কা মারল গাজীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে।

এক হাত বিছানায়, আরেক হাত **উঁচিয়ে শেখ মুজিব দেখাতে** লাগলেন জানালার বাইরে, 'ওই দেখো।'

'কী?'

'চাঁদ। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। চাঁদের আলোর চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কী আছে বলো তো?'

চাঁদের আলোয় মুজিব ভাইয়ের মুখখানা অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। গাজীউলের মনে হচ্ছে, এই দৃশ্য কি সত্যি হতে পারে? এই কথামালা?

এই লোকটা সারাটা দিন খাজা নাজিম উদ্দিন সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। একটার পর একটা ইস্যু খুঁজে বের করছেন। প্রতিদিনই মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়া চাই তাঁর। এর মধ্যে জেলখানার অভিজ্ঞতাও তাঁর কম হয়নি। সর্বক্ষণ তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছে **মুসলিম লীগ সরকার। আর** তিনি কিনা এইখানে, সলিমুল্লাহ **হলের ১৬ নম্বর কক্ষে শুয়ে** আকাশের চাঁদ দেখছেন!

ঘরে তো কোনো ফুলের ঘ্রাণও নাই। যা আছে তা চর্মরোগের ওষুধের তীব্র ধাতব ঝাঁঝালো গন্ধ।

'মুজিব ভাই, আমি ঠিক ধরতে পারছি না কোনটা সত্য—চাঁদের আলো, নাকি এই চুলকানির ওষুধের ঝাঁজ!' গাজী হেসে বললেন।

'খাজার শাসনে দুইটাই সত্য, গাজী। তোমাকে চুলকানির ওষুধও দিতে হবে, আবার চাঁদের আলোও উপভোগ করতে হবে।

হেথায় ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।'

শেখ মুজিব, ২২ বছরের শুকনো পাতলা গাজীউলের চেয়ে বছর সাতেকের বড়, অত্যন্ত সুদর্শন, তাঁর গলাটাও ভারি চমৎকার, বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে সেটাকে খোলসা করে রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলীলায় মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন।

গাজী বিস্মিত হলেন না। মুজিব ভাইয়ের স্মরণশক্তি অসাধারণ, আর যেখানেই যান তিনি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই হাতে করে নিয়ে যান। একবার পড়লেই তিনি সেটা মনে রাখতে পারেন।

মুজিব বললেন, এর আগের লাইনগুলো শোনো—

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা ॥

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নবশশী **ছাদের** 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?

হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, **আঁখিজলে রজনী জাগ**—
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ের কুশল মাগ' ॥

মুজিব বলে চলেন, 'আমার মেয়েটা, হাসু, ওর বয়স এক পেরিয়ে গেল। ওর মা ওকে চাঁদ দেখায়। আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা। এবার যে গেলাম টুঙ্গিপাড়ায়, মেয়েটাকে ফেলে আসতে আমার কষ্ট হয়েছিল, **জানো**, গাজীউল। ওর মায়ের প্রতিও আমি **ন্যায়বিচার করতে পারলাম** না। ওদের যে ঢাকায় নিয়ে আসব, **সেই অবস্থাও তো এখানে** নাই। আন্দোলন আর আন্দোলন। **যেকোনো সময় গ্রেপ্তার করে** ফেলতে পারে ওরা। কোনো কিছুর **ঠিকঠিকানা** নাই।'

গাজীউল বুঝতে পারেন, মুজিব ভাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেজা।

সামনে আসলেই অনেক কাজ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী আসবেন। তাঁকে একটা স্মারকলিপি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মিটিংয়ে গিয়েছিলেন মুজিব। ১৭ নভেম্বর ১৯৪৮-এর সেই সভায় কামরুদ্দীন আহমদকে ভার দেওয়া হয়েছে মেমোরেন্ডামটা রচনা **করার**। লিয়াকত আলী ঢাকায় এলে তাঁর **বিরুদ্ধে** বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

আর **সরকারের লোকজনের** মাথাও খারাপ হয়ে গেছে বলে **মনে হয়। ফজলুর রহমান**, কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী, এখন ঘোষণা করছেন, বাংলা লিখতে **হবে আরবি** হরফে। এর আগে একবার প্রস্তাব করা হয়েছে রোমান হরফে বাংলা লেখার। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই উর্দু ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে মিছিল হচ্ছে, সভা হচ্ছে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। আর জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে হু হু করে। শেখ মুজিব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেও মিছিল সংগঠিত করছেন। কর্ডন-প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন **করছেন**। কর্ডন-প্রথা হলো, খাদ্য-উদ্বৃত্ত জেলা থেকে কোনো খাদ্য বাইরের জেলায় বেসরকারিভাবে যেতে পারবে না, সরকার সেটা কিনে নিয়ে তারপর নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা নেবে। এটা করতে গিয়ে খাদ্যসংকট আরও বাড়ানো হচ্ছে।

গাজী শেখ মুজিবের চোখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের **নিচে দুটো চাঁদ টলমল করছে**।

কথা ঘোরানোর জন্য গাজী বললেন, 'মুজিব ভাই, র**বীন্দ্রনাথের** ক**বি**তার **ভক্ত** আপনি কেমন করে হলেন? আপনার লিডার সোহরাওয়ার্দী তো বাংলাই ভালো করে বলতে পারেন না। আর আপনি তাঁর অনুসারী হয়ে সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথ আওড়ান।'

মুজিব হেসে উঠলেন শব্দ করে।

'কী ব্যাপার, হাসলেন যে!'

'আছে ব্যাপার।' বলে তিনি লুঙ্গি পরে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাতমুখ ধোয়ার জন্য।

এসে দেখেন গাজী ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মুজিব বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

এই বিছানা থেকে সরাসরি চোখ যাচ্ছে চাঁদের দিকে।

তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চাঁদের ওপর দিয়ে মেঘ দৌড়াচ্ছে হালকা শরীর নিয়ে। মনে হচ্ছে চাঁদটাই দৌড়াচ্ছে। আসলে তো চাঁদ দৌড়ায় না, মেঘেরা দৌড়ায়।

কত কথা মনে পড়ে মুজিবের।

সাতচল্লিশের পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বারবার এসেছেন পাকিস্তানে। ঢাকায় এসে খাজা নাজিম উদ্দিনের অতিথি হয়েছেন। করাচিতে গণপরিষদের সভায় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই ভাষণ দিয়েছেন। প্রতিবারই তিনি কথা বলেছেন অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে, ভারত-পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে। লিডারের এই অসাম্প্রদায়িকতার গুণটিকে মুজিব বড় ভালোবাসেন। কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে সরাসরি এসেছেন যশোরে। শান্তির সপক্ষে সভা করে ফিরে গেছেন দিনে দিনে। খুলনায় এসেছিলেন। সেখান থেকে ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ। মুজিব ফরিদপুর-গোপালগঞ্জের সভা সফল করার জন্য খেটেছেন প্রচুর। সভা সুন্দরভাবে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এপ্রিল মাসেও তিনি এসেছিলেন ঢাকায়। সদরঘাট করোনেশন পার্কে সভা করেছেন। তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন শাহ আজিজের মুসলিম ছাত্রলীগের পাঠানো একটা ছেলে দড়ি বেয়ে মঞ্চের পেছনে উঠে পড়ে। তার হাতে ছিল ছুরি। সে এসেছিল সোহরাওয়ার্দীকে খুন করতে। জনতা অবশ্য ছেলেটিকে ধরে ফেলে।

সোহরাওয়ার্দী বারবার এই দেশে আসুক, খাজা নাজিম উদ্দিনরা তা চান না। না চাইবারই কথা। তিনি এলে এই দেশে আর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের রাজনীতি চলবে না। খাজা আর লিয়াকত আলীরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। গত জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় মানিকগঞ্জের একটা শান্তিসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য।

কলকাতা থেকে সোহরাওয়ার্দী আসবেন বিমানে।

সকাল সকাল মুজিব হাজির হয়েছিলেন তেজগাঁও বিমানবন্দরে। কামরুদ্দীন আহমদসহ ১৫০ মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

কিন্তু দুই মাস আগে লিডার এসে যে বাড়িতে উঠেছিলেন, 'দিলকুশা' নামের সেই বাড়ির মালিক খাজা নসরুল্লাহই উপস্থিত নেই। কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, মানিকগঞ্জের লঞ্চ তো ছাড়বে সেই সন্ধ্যায়। এতক্ষণ লিডার কোথায়ই বা থাকবেন, আর যাবেনই বা কী করে? খাজা নসরুল্লাহ সাহেব যে এখনো এলেন না!

বিমান অবতরণ করল রানওয়েতে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ৫৬ বছর বয়সী সোহরাওয়ার্দী সাহেব। পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত লিডারকে বেশ ফুরফুরেই দেখাচ্ছিল। পূর্ব আকাশে সূর্য ছিল, আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে, তিনি ভ্রু কুঁচকে আছেন। তবু তাঁর মুখ হাসি হাসি।

মুজিব হাত বাড়িয়ে দিলেন। লিডার তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

কুশল বিনিময়ের পরে লিডার বললেন, 'চলো, যাওয়া যাক। খাজা কই?'

'তিনি আসেননি।' কামরুদ্দীন সাহেব জানালেন।

'আমি তাকে তার করে এসেছি। সে তো জানে আমি তার বাসায় উঠব। দেখো তো কী ব্যাপার?'

কামরুদ্দীন সাহেব ছুটলেন বিমানবন্দর অফিসে, একটা ফোন করার জন্য। ফিরে এসে বললেন, 'খাজা সাহেব বললেন, তাঁর বাড়িতে অনেক মেহমান। সুতরাং ওখানে তিনি লিডারকে নিতে পারছেন না।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তা কী করে হয়! আমি ফোনে কথা বলি। কোথাও কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।'

ভুল বোঝাবুঝিটা কী, মুজিব সেটা আঁচ করতে পারছেন। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় সরকার চায় না আপনি বারবার পূর্ব বাংলায় আসেন। কাজেই তারা সবাইকে বলে দিয়েছে কেউ যেন আপনাকে বাড়িতে না ওঠায়।'

কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনার ফোন করাটা উচিত হবে না।'

বিমানবন্দর থেকে ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে তাঁরা চললেন আমজাদ খান সাহেবের জয়নাগ রোডের বাসায়। ততক্ষণে আকাশে মেঘ জমে গেছে। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। ভাপসা গরম।

আমজাদ সাহেবও অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে একটা প্রহরের জন্য ঠাঁই দিতে রাজি হলেন না। এ তো ভারি মুশকিল হলো!

মুজিবের বড় রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, লিডারকে নিয়ে সোজা চলে যান পার্টি অফিসে। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে। কিন্তু লিডারের মুখ

হাত উঁচিয়ে শেখ মুজিব দেখাতে লাগলেন জানালার বাইরে

হাসি হাসি। তিনি রাজনৈতিক নেতা। জানেন যে রাজনীতি মানেই চড়াই-উতরাই। নাগরদোলার মতো একজন রাজনীতিকের জীবন। কাল যিনি পরম বন্ধু, আজ তিনি দুচোখের বিষ।

এদিকে কামরুদ্দীন সাহেব ছুটলেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের বাসায়। কামরুদ্দীন সাহেব পরে জানিয়েছেন মুজিবকে, শাহজাহান সাহেবের স্ত্রী নূরজাহান, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো বড় মানুষ আসছেন শুনে তিনি রান্নাঘরে চলে গেছেন সোজা।

কামরুদ্দীন সাহেব এসে বললেন, 'লিডার, চলুন। খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'কোথায়?'

'প্রশ্ন নয়,' কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, 'চিরকাল আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, আমরা আপনার কথামতো চলেছি। আজকে না হয় আপনি আমার নেতৃত্ব মেনে নিন। আমার সাথে চলুন।'

কথা না বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মুজিব আর কামরুদ্দীন সাহেবও তাঁর সঙ্গে চললেন। কর্মীরা পেছনে পেছনে তাঁদের গাড়ি অনুসরণ করলেন।

নূরজাহান খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন বিশাল। অনেক পদের রান্না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তো খেলেনই, কর্মীবহরের খাওয়াও সম্পন্ন হলো আয়েশের সঙ্গেই।

শাহজাহান সাহেব ও নূরজাহান তাঁদের শয়নকক্ষটাই ছেড়ে দিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্য।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় স্টিমার ছাড়বে বাদামতলী ঘাট থেকে। কর্মীবহরসমেত নেতা চললেন ঘাটে। সন্ধ্যা নামার আগেই।

তখন বাদামতলীতে ভিড় জমে উঠেছে। কুপিবাতি জ্বলছে ফেরিওয়ালাদের পসরার সামনে। কুলিরা হাঁকাহাঁকি করছে। ভিখিরিরা ভিক্ষা করছে গান গেয়ে। স্টিমার ঘাটে ভেড়ানোই ছিল। নেতা সেটায় উঠলেন। দোতলায় কেবিনের সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। সেখানে চেয়ার পাতা। সবাই গিয়ে সেখানে বসে পড়া গেল। আড্ডাও উঠল জমে। আটটা বাজল, সাড়ে আটটা। কিন্তু স্টিমার ছাড়ার কোনো নামই নাই। সারেংকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানাল, পুলিশ সাহেব এসে বলে গেছেন, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত জাহাজ ছাড়া যাবে না।

মুজিব উঠলেন। কামরুদ্দীন সাহেব ছুটলেন। তাঁরা ফোন করতে লাগলেন নানা কর্তাব্যক্তির কাছে। জানা গেল, মুখ্যমন্ত্রী কল বুক করেছেন করাচিতে। কেবিনেট মিটিং চলছে। করাচি থেকে ফোন এলে তারপর তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন জাহাজ ছাড়বে কি ছাড়বে

না।

সাড়ে নটায় পুলিশের গাড়ি এল দুটো। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের আইজি, ডিআইজি। তাঁরা হাতে করে এনেছেন একটা সরকারি আদেশপত্র। সোহরাওয়ার্দী মানিকগঞ্জে বক্তৃতা করতে যেতে পারবেন না। তাঁকে অনতিবিলম্বে দেশ ছাড়তে হবে।

পুলিশের আইজি জাকির হুসেন। এই জাকির হুসেনকে ঢাকার পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। তারপর একজন ইংরেজ সাহেব যখন এই প্রদেশের আইজি পদে নিয়োগ পেল, তখন বাঙালি পুলিশ কর্তাদের সবাইকে এক ধাপ করে পদাবনমনের সামনে পড়তে হলো। তখন এঁরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে বলে-কয়ে ওই ইংরেজের নিয়োগ বাতিল করিয়েছিলেন। আজকে তাঁরাই বয়ে এনেছেন সোহরাওয়ার্দীর বহিষ্কারাদেশ।

জাকির হুসেন বললেন, 'আপনি আজ রাতে আমার বাসায় থাকতে পারেন।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'থ্যাংকস। ইফ আই এম নট আন্ডার অ্যারেস্ট আই উড প্রেফার টু রিমেইন উইথ মাই হোস্ট।'

জাকির হুসেন বললেন, 'আপনি যেখানে খুশি আজকের রাতটা কাটাতে পারেন।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'টেল ইয়োর নাজিম উদ্দিন দ্যাট সোহরাওয়ার্দী ইজ নট ইয়েট ডেড।'

বুড়িগঙ্গায় তখন ঘন অন্ধকার। ঘাটের আলোয় নদীর পানিতে কালো ঢেউয়ের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। দূরে নৌকার গায়ে গায়ে আলো। সোহরাওয়ার্দী, কামরুদ্দীন, শেখ মুজিব—সবাই নেমে এলেন জাহাজের ডেক থেকে

সোহরাওয়ার্দী সাহেব পুলিশদের বললেন, 'একটা ছোট্ট সিদ্ধান্ত নিতে এত দেরি করলে চলবে? অযথা এতজন সাধারণ যাত্রীকে আপনারা এতক্ষণ ধরে কষ্ট দিলেন।'

শাহজাহান সাহেবের বাসাতেই ফিরে এলেন তাঁরা। এসে দেখেন, বাসার চারদিকে পুলিশ। ভেতরেও পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বসা।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'শাহজাহান সাহেবের না কোনো ক্ষতি করে বসে এরা?'

শাহজাহান সাহেব অবশ্য ভয় পেলেন না। সবাই মিলে ধরে শোবার ঘরের খাটটা ফ্যানের নিচে আনা হলো। কর্মীরা একে একে চলে গেল। শুধু রয়ে গেলেন কামরুদ্দীন।

মুজিবও বিদায় নিলেন। পরের দিন ভোর থাকতে থাকতেই মুজিব এসে হাজির শাহজাহান সাহেবের বাসায়।

নূরজাহান, কামরুদ্দীন, মুজিব প্রবেশ করলেন শোবার ঘরে। দেখতে পেলেন, লিডার একমনে চোখ বুজে কবিতা বলে চলেছেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,/ শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,/ যাবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই,/ দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে।'

নূরজাহান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার এমএ ক্লাসের ছাত্রী, বললেন, 'শহীদ সাহেব, আপনি বাংলা পড়েন? বাংলা কবিতা পড়েন? রবীন্দ্রনাথ পড়েন?'

সোহরাওয়ার্দীর সামনে নূরজাহানের নোটখাতা, সেটা বন্ধ করে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তো বাংলার ছাত্রী। আমাকে বোঝাও তো মধুমাখা আঁখিজল মানে কী? লবণাক্ত আঁখিজল কি মধুমাখা হতে পারে?'

তারপর তিনি উঠলেন। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমি দুঃখিত। আমার জন্য তোমাদের কষ্ট করতে হলো।'

চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন মুজিব। তাঁর চোখে আবারও অশ্রু। আজ তাঁর কী হয়েছে? এখনই যদি গাজী চোখ মেলে, সে দেখে ফেলবে তাদের মুজিব ভাইয়ের চোখ ভেজা। এও কি হয়?

তিনি চোখ মুছলেন। এই অশ্রু কি মধুমাখা?

গাজীউল হক ঘুমুচ্ছে। ঘুমাক। ও জেগে উঠলে ওকে বলতে হবে, 'শোনো গাজী, আমার লিডার শুধু রবীন্দ্রনাথ পড়েনই না, তিনি বোঝারও চেষ্টা করেন। মধুমাখা অশ্রুজল মানে কী! তুমি কী ভাবো, বলো তো?'

মুজিবের মনে রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি দোলা দিয়ে যাচ্ছে:

সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব—
তারপর ছুটি নিব।
সুখ হাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরও আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে,
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মতো রবে....

মুজিবের মনে পড়ে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কীভাবে পুলিশ পরের দিন বিকেলে গাড়িতে তুলে নেয়। মুজিবও সেই গাড়িতে উঠে পড়েন। লিডারকে পুলিশ গোয়ালন্দগামী জাহাজে তুলে দেয়

মুজিব তাঁকে কেবিনে বসিয়ে দিয়ে তারপর নেমে আসেন।

জাহাজ ছেড়ে দেয় ভেঁপু বাজিয়ে। পানিতে ঢেউ তোলে। ঢেউ আছড়ে পড়ে ঘাটে। বাঁধা নৌকাগুলো দুলে ওঠে। জাহাজটা আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে যায়।

জেটি শূন্য হয়ে গেলে মুজিবের চারপাশটা যেন শূন্য বলে মনে হয়।

তবু তিনি নিজেকে শক্ত করেন। নেতা বলে গেছেন অসাম্প্রদায়িকতার পথে সংগঠন আর আন্দোলন চালিয়ে যেতে। তিনি আবার আসবেন।

সলিমুল্লাহ হলের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। এই চাঁদ উঠেছে কলকাতায়। একই চাঁদ উঠেছে টুঙ্গিপাড়ায়।

লিডারের সঙ্গে তাঁর কত দিনের পথচলা। কত মধুর স্মৃতিই না তাঁর আছে সোহরাওয়ার্দীকে ঘিরে। বছর তিনেক আগের কথা। সামনে নির্বাচন। প্রার্থী মনোনয়নের জন্য জনমত যাচাই করতে হবে। নেতা চলেছেন গোপালগঞ্জের উদ্দেশে। সঙ্গে তাঁর একনিষ্ঠ কর্মী মুজিব তো আছেনই। আরও জনা পনেরো কর্মীও চলেছেন নেতার সঙ্গে। বাহন গুণটানা আর দাঁড় বাওয়া নৌকা। সিন্দিয়াঘাট থেকে নৌকা যাত্রারম্ভ করেছে। গোপালগঞ্জ আরও ২০ মাইল দূরে। তাড়াতাড়ি পৌঁছা দরকার।

মুজিব নিজেই দাঁড় বাইতে লাগলেন। সঙ্গে অন্য কর্মীরাও দাঁড় চালাতে লাগলেন। মাঝিদের ছেড়ে দেওয়া হলো গুণ টানার জন্য।

সাতপাড় বাজারের কাছে এসে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন, 'অল্পক্ষণের জন্য নৌকাটা একটু দাঁড় করাও।'

তা-ই করা হলো। নেতা নেমে গেলেন নৌকা থেকে। ওই ছোট্ট বাজার থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে এলেন চিঁড়া আর খেজুরের গুড়।

মুজিব বিস্মিত। তাঁর কেউই তাঁকে খাবারের কথা বলেন নাই। সবাই মিলে গুড়-চিঁড়া খেয়ে নেওয়া গেল।

সারা রাত নৌকা চলল। আর কোনো খাবার তাঁদের মুখে জুটল না

মুজিব নেতার এই গুণের কথা জানেন। ধনীর ঘরের ছেলে, অভিজাত পরিবার। কলকাতা ক্লাবের সদস্য। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ। তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, সে সময় এক ইংরেজ আইসিএস কর্মকর্তা ফাইলের নোটে যা লিখেছিলেন, সোহরাওয়ার্দীর তা মনঃপূত হয়নি। তিনি ওই অফিসারকে তিরস্কার করলেন। গভর্নরকেও জানালেন, 'এই অফিসার তো নোটই লিখতে জানে না।' গভর্নর বললেন, 'সেকি, ও তো অক্সফোর্ডের এমএ।' সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'অক্সফোর্ডের এমএ তো আমিও। আমি খুব জানি, সব ইংরেজ ভালোমতো ইংরেজি জানে না।' এ রকম প্রবল যাঁর ব্যক্তিত্ব, তিনি কিনা তাঁদের সঙ্গে একটা দেশি নৌকায় বসে সারা রাত জেগে গ্রামবাংলা সফর করছেন!

মুজিবের আজ ঘুম আসছে না। এই রকম সাধারণত হয় না। যেকোনো স্থানে চোখ বোজামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর আছে। তা না হলে কারাগারে, কিংবা স্টিমারে, কিংবা পার্টি অফিসে, কিংবা পাতলা খান লেনের মেসে—যেখানে রাত সেখানেই কাত, আর সেখানেই নিদ্রাপাত তিনি করতে পারতেন না।

সোহরাওয়ার্দী তখন অবিভক্ত বাংলার সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। থিয়েটার রোডের বাসভবনে নিজের ডেস্কে বসে সেদিনের ডাক দেখছেন তিনি। মুজিব বসে আছেন তাঁর ডেস্কের অপর পাড়ে।

একটা পোস্টকার্ড হাতে তুলে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যেন। উঠে পড়লেন।

'কী খবর, লিডার? কোনো জরুরি খবর?'

'আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে খিদিরপুরের দিকে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি বসে পড়লেন গাড়িতে। মুজিবও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন শকটে। নেতা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন। মুজিব বসে আছেন সারথির পাশের আসনে। গাড়ি গিয়ে থামল খিদিরপুর ওয়ার্ডগঞ্জ শ্রমিক বস্তিতে। তাঁরা গাড়ি থেকে নামলেন। মন্ত্রীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে পুরো বস্তি যেন ভেঙে পড়ল। জনারণ্যের ভেতর দিয়ে লিডার হাঁটছেন, সঙ্গে মুজিব। একে-ওকে জিজ্ঞেস করলেন লিডার, অমুকের ঘর কোনটা? বস্তির জনস্রোত তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। একটা জীর্ণ ঘরের সামনে এসে তাঁরা থামলেন। জনতাকে বাইরে থাকতে বলে সোহরাওয়ার্দী মাথা নিচু করে ঢুকে পড়লেন ওই পর্ণকুটিরে, সঙ্গে মুজিব। মাটিতে পাতা মাদুরের ওপর শুয়ে আছে একটা কঙ্কালসার দেহ। অতিবৃদ্ধ লোকটি কাশছে ঘন ঘন। তিনি বললেন, 'এই মুরুব্বিকে আমার গাড়িতে তুলে দাও।'

জনতার সঙ্গে হাত লাগালেন মুজিবও। গাড়িতে উঠে তিনি বস্তিবাসীকে বললেন, 'আমাকে আগে খবর দাওনি কেন তোমরা?'

তারপর গাড়ি সোজা চলে এল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে।

হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো বৃদ্ধকে। মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, 'এর চিকিৎসার যেন কোনো ত্রুটি না হয়। যা খরচ লাগে, সব আমি দেব।'

তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন এই বৃদ্ধকে।

১৯৪৩ সালের দিককার কথা। মুজিব একবার বসে আছেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের থিয়েটার রোডের বাসায়, শোবার ঘরে। বিছানার ওপর একটা কালো খাতা। লিডার ঘরে ছিলেন না। মুজিব আনমনেই কালো খাতাটা খুলে পাতা মেলে ধরলেন। কতগুলো লোকের নাম আর ঠিকানা লেখা। তার পাশে একটা করে টাকার অঙ্ক। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো।

নেতা এই বিপন্ন মানুষগুলোকে প্রতি মাসে পেনশন দেন। এর পেছনে তাঁর মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হয়। জিজ্ঞেস করেছিলেন মুজিব, 'মাসে মাসে এত টাকা পেনশন কেন দিচ্ছেন?' নেতা করুণ একটা হাসি দিয়ে বলেছিলেন, 'দেশের অবস্থা তো জানো না! ও তালিকা আমার দিন দিন বড় হচ্ছে। কবে যে এদের একটা হিল্লা আমরা করতে পারব!'

মুজিবের তন্দ্রামতো আসে। তিনি দেখতে পান, তাঁরা যাত্রী নৌকায় চড়ে চলেছেন পার্টির কাজে। একটা মাত্র মাঝি সেই নৌকার। মুজিব তাঁকে বললেন, 'লিডার, আপনি এইভাবে হালটা সোজা ধরে থাকেন। আমি আর নৌকার মাঝি দাঁড় টানি। সময়টা বাঁচবে।' সোহরাওয়ার্দী সাহেব হাল ধরলেন। তারপর লিডার বললেন, 'তুমি এবার হাল ধরো, মুজিব। আমি দেখি দাঁড় টানতে পারি কি না।'

'ও আপনি পারবেন না, লিডার। আপনি বড় ঘরের ছেলে। কলকাতা শহরে ননি-মাখন খেয়ে বড় হয়েছেন। গাড়ি চালাতে পারবেন, কিন্তু নৌকার দাঁড় বাওয়া আপনার নরম হাতের কাজ নয়। আমরা নদীপারের ছেলে। নদীতেই বলা যায় বড় হয়েছি।'

'আরে দাও তো। কথা শোনো।'

লিডার দাঁড় ধরলেন প্রায় জোর করেই, হাল ধরলেন মুজিব।

মাঝি গান ধরল, 'মাঝি বায়া যাও রে,/ অকুল দরিয়ায় আমার ভাঙা নাও রে/ মাঝি বায়া যাও রে।'

তন্দ্রা ভেঙে যায় মুজিবের। গাজীউল ঘুমিয়ে পড়েছেন। চাঁদটা আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়েছে অনেকটা ওপরে।

নাহ। এভাবে কবিতা আর আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। কাল ভোরে উঠতে হবে। আবার নামতে হবে মিছিলে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমনের বিরুদ্ধে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে হবে।

২.

হেমন্তকাল। আমগাছের পাতা শুকিয়ে আসছে। শীতে ঝরবে পাতা, বসন্তে পাতা গজাবে, আসবে মুকুল। কিন্তু হেমন্তের সকালের রোদটা বড় ভালো লাগে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের আমগাছের একেবারে মগডালে গিয়ে বসে তারা। রোদটা যত বেশি গায়ে মেখে নেওয়া যায়।

ব্যাঙ্গমা বলে, বলো তো শেখ মুজিবের প্রিয় কাজ কোনটা?

ব্যাঙ্গমি বলে, মিছিল করা। মিছিল করতে না পারলে তার হাত-পায়ে বিষ-বেদনা ওঠে। এইবার তুমি কও তো, শেখ মুজিব কোন প্রতিভাটা নিয়া জন্মাইছে?

ব্যাঙ্গমা বলে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের হেমন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে, আহ্, ভাষণটা বড় ভালো দেয় এই নওজোয়ান!

ব্যাঙ্গমি আমগাছের ডালে মুখ ঘষে নিয়ে বলে, আইজ থাইকা ঠিক চার বছর আগে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সভা হইতেছিল। আগের দিন সোহরাওয়ার্দীর বাড়িতে অনেকে মিলা ঠিক করল, আবুল হাশিম সাহেব কমিউনিস্টঘেঁষা, তারে আর সাধারণ সম্পাদক রাখা চলব না। হাশিম সাহেবও সেইটা মাইনা নিছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন শেখ মুজিব ভাষণ দেওয়া শুরু করল, সেই প্রথম তার লিডার সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরামর্শ না কইরাই মুজিব হাশিম সাহেবের পক্ষে ভাষণ দিতে লাগল, আর পুরা কাউন্সিল মুজিবের কথায় একেবারে সাপের মন্তরের মতো মোহিত হইয়া গিয়া আবুল হাশিমকেই আবার সাধারণ সম্পাদক করল, মনে আছে?

থাকব না কেন? মুজিব যখনই ভাষণ দেয়, তখনই শ্রোতারা তার কথার জাদুতে ভাইসা যায়। এইটা তো কতই দেখলাম। তবে আরও দেখবা। মুজিব আরও অনেক ভাষণ দিব। একটা ভাষণ দিব একেবারে দুনিয়া ওল্টাইনা, সেইটা আর ২২/২৩ বছর পর। আর মুজিব তার লিডার শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথার অবাধ্য হইব আরও একবার। সেইটাও আরও দেড় যুগ পরে। যখন আয়ুব খানের মার্শাল লর পর প্রথম পলিটিক্স ওপেন করব, তখন উনি নেতার নির্দেশ অমান্য কইরা আওয়ামী লীগ খুইলা বসব। সেই অবাধ্য হওয়াটাই বড় কাজের কাজ হইব।

কিন্তু এই সব বড় কাজের প্রস্তুতি তার চলতাছে রোজকার মিছিল মিটিং জনসভা প্রতিবাদ আর গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্য দিয়া। খাজা নাজিম উদ্দিন গোপালগঞ্জ যাইতাছে। তার গোপালগঞ্জ। সেইখানকার এমএলএ শামসুদ্দিন আহমেদ এলাকা গরম কইরা ফেলছে। মহকুমায় পোনে ছয় লক্ষ মানুষ। প্রত্যেকের চান্দা এক টাকা। পোনে ছয় লাখ টাকা চান্দা ওঠানো হইছে। কোর্ট মসজিদ আর পাকিস্তান মিনারের লাইগা ৪০ হাজার টাকা, পাশের রাস্তার লাইগা ৩০ হাজার। বাকি টাকা তারা দিতে চায় জিন্নাহ ফান্ডে। মুজিব কী করব?

৩.

রাতের বেলা, তখন রাত ১১টা বাজে, গোপালগঞ্জের আদালতপাড়া এলাকায় তখন গভীর রাত, শীত আর কুয়াশা, কামিনী ফুলের ঘ্রাণ সেই কুয়াশার ওপরে ভর করে ভাসছে, কুকুর ডাকছে, শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে নদীর ধারে শটিবন হেলেঞ্চাবন থেকে, ঝিঁঝি রব তো প্রকৃতিরই অংশ, শেখ মুজিব তাঁদের গোপালগঞ্জের বাসায় এসে হাজির হন। দরজায় শব্দ করেন।

'কে?' লুৎফর রহমান সাহেবের কাশি হয়েছে, কে বলতে গিয়েই কাশির গমক ওঠে। 'আব্বা, আমি খোকা।'

লুৎফর রহমান লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বিছানা ছাড়েন। টেবিলের ওপরে রাখা লণ্ঠনটার নব ঘুরিয়ে আলো বাড়ান। চিমনিতে কালো দাগ পড়েছে। কয়েকটা পোকা চিমনির পাশে উড়ছে, একটা মড়া পোকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে পিঁপড়ার দল।

তিনি কবাটের খিল খোলেন। হাতে হারিকেন। হারিকেনের আলোয় ছেলের মুখটা দেখে তাঁর বুকে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভূত হয়। পরক্ষণেই একটা দুশ্চিন্তাও তাঁর মনে ঝিলিক দিয়ে যায়। করাচি থেকে খাজা নাজিম উদ্দিন আসছেন, ছেলে না আবার কোনো ঝামেলা করে বসে। তিনি আদালতের কর্মচারী; সরকার বাহাদুরের সর্বোচ্চ কর্তার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোর সাহস তো তাঁর বুকে আসে না।

'এত রাতে? কোত্থেকে?'

'শামসুদ্দিন এমএলএর বাড়ি থেকে।'

'হঠাৎ আসলা? খবর দিয়া আসলা না?' লুৎফর রহমান খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন।

'খবর তো পাইতেছেনই। ছয় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলছে। গোপালগঞ্জের গরিব মানুষের টাকা। এই টাকা নাকি অরা জিন্নাহ

রিলিফ ফান্ডে দিবে। তারই প্রতিবাদ করতে আসছি।'

'হাতমুখ ধোও। ভাত খাও। জয়নালরে বলি ভাত রান্ধতে।'

'না, এত রাতে আর জয়নালরে কষ্ট দেওয়ার দরকার নাই। আমি খাইয়া আসছি। আপনি ঘুমায়া পড়েন। বড় কাশি হইছে দেখছি। ডাক্তার দেখাইছেন?'

'না, কাশির আবার ডাক্তার কী! তুলসীপাতার রস খাইতাছি। সেরে যাবে নে।'

মুজিব আলনা থেকে নিজের লুঙ্গি-গেঞ্জি নিয়ে কাপড় পাল্টালেন। পুকুরপাড়ে গিয়ে পানি তুলে হাতমুখ ধুলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু তাঁর ঘুম আসছে না। ছটফট লাগছে। আজকে শামসুদ্দিন আহম্মেদের বাসায় অভ্যর্থনা কমিটির মিটিং ছিল। সেখানে তিনি হাজির হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এই যে পোনে ছয় লাখ টাকা চাঁদা উঠল, এটা বাংলার গরিব মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা। এই টাকা কেন আমরা করাচিতে পাঠাব! ওরা আমাদেরকে নতুন কলোনি বানিয়েছে। কথায় কথায় শোষণ করছে। আজ বাংলাজুড়ে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। মানুষ না খেয়ে আছে। আর আমরা টাকা ব্যয় করছি খজা নাজিম উদ্দিনের সংবর্ধনায়! টাকা পাঠাচ্ছি জিন্নাহ ফান্ডে! আজকে গোপালগঞ্জে কোনো কলেজ নাই। এই টাকায় আমরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অনেকেই 'আরে থামো মজিবর। তুমি খালি লেকচার দেও', 'স্যার খাজা সাহেব আসতেছেন আমাদের গোপালগঞ্জে, এ তো আমাদের সৌভাগ্য' ইত্যাদি বলে তাঁকে বসিয়ে দেন।

বসিয়ে দিলেই বসে যাওয়ার পাত্র তো মুজিব নন। তিনি জানেন এর বিহিত কী করে করতে হবে। তাঁর পক্ষে আছে মানুষ। গোপালগঞ্জের মানুষ। কাল সকাল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। মানুষকে সংগঠিত করতে হবে।

আটাশের যুবক মুজিব এরই মধ্যে গোপালগঞ্জে তুমুল জনপ্রিয়। এখানে তিনি বহুদিন পড়েছেন মিশনারি স্কুলে, যুক্ত থেকেছেন এলাকাবাসীর ভালো-মন্দের নানা চড়াই-উতরাইয়ের সঙ্গে। স্কুল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। শুধু যে গোপালগঞ্জে খেলেছেন তা নয়, হায়ারে খেলতে এদিক ওদিকও গেছেন। একবার তাঁর ফুটবল খেলতে গেলেন পাতিককান্দি ইউনিয়নের ঘোরদাইড়ে। গোপালগঞ্জ থেকে খেয়া নৌকায় করে যেতে হয়। খেলায় জিতল মুজিবদের দল। খেলা শেষে যখন খেয়া নৌকায় উঠলেন, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে চরাচরে। মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে মসজিদে। আকাশে আলোর আভা আছে একটুখানি। হঠাৎ শুরু হলো ধূলিঝড়। মুজিব তখন নৌকার হাল ধরে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমিন মামাসহ আরও কয়েকজন। প্রচণ্ড বাতাসে নৌকা বাঁক নিতে চাইছে। তিনি দুই হাতে শক্ত করে ধরে আছেন হাল। এই অবসরে চোখ থেকে উড়ে গেল তাঁর চশমা। তিনি চশমা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ও মামা, হাল ধরো, আমার চশমা পড়ে গেছে। আমি কিছুই দেখি না।' আমিন মামা হাল ধরলেন। সবাই মিলে চশমা খুঁজতে লাগল নৌকার পাটাতনে। নাহ্, পাওয়া গেল না। ওটা নদীর জলেই তলিয়ে গেছে কোথাও। নৌকা অপর পাড়ের ঘাটে ভিড়ল। কিন্তু তিনি হাঁটবেন কী করে। অন্ধকারে চোখে তো কিছুই দেখছেন না। শেষে হরিদাসপুর ডাকবাংলোয় রাত কাটাল কিশোর ফুটবলারের দল।

এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগলে 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' বলে স্লোগান দিয়ে এগিয়ে গেছেন স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে। গরিব ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গড়ে তুলে মুষ্টিভিক্ষা করে তহবিল জোগাড় করেছেন। আবার মুসলিম লীগের সম্মেলনে নিজের শক্তি প্রয়োগের যখন দরকার হয়েছে, তখন বিপুল কর্মীর সমাবেশ ঘটিয়ে সেটা করেও দেখিয়েছেন।

গত রাতেই মিছিল বের করেছেন, 'নাজিম উদ্দিন ফিরে যাও'। এলাকার কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন পাড়ায় পাড়ায় খবর দেওয়ার জন্য। আগামীকাল কয়েক হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল বের করতে হবে। মুজিবুর ডাক দিয়েছেন, এলাকার টাকা এলাকার উন্নয়নে খরচ করতে হবে। সবাই যেন মিছিলে আসে।

খাজা নাজিম উদ্দিন আসছেন নদীপথে। অর পি সাহার গ্রিনবোটে আসবেন তিনি। এদিকে শহরের পরিস্থিতি খারাপ। হাজার হাজার লোকের মিছিল প্রদক্ষিণ করছে শহর। সবার মুখে এক স্লোগান: 'নাজিম উদ্দিন ফিরে যাও'। চারদিক থেকে আরও মিছিল আসছে।

গ্রিনবোট যে ঘাটে ভিড়বে, সেই এলাকাটা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। মিছিল সেই কর্ডন ভাঙার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। পুলিশও বাঁশি বাজিয়ে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। হাজার হাজার মানুষ। পুলিশের সাধ্য কী এই জনস্রোত রুখে দেয়! গ্রিনবোটে খাজা নাজিম উদ্দিন। আর নদীর ঘাটে মানুষের মিছিল আর স্লোগান। আর ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া।

খাজা নাজিম উদ্দিন বোটে থেকেই টের পেলেন একটা কিছু অঘটন ঘটছে। তিনি জানতে চাইলেন পুলিশের কাছে, 'হোয়াটস হ্যাপেনিং দেয়ার।'

'দে আর হেয়ার টু ওয়েলকাম ইউ, স্যার।'

'দেন হোয়াই আর দে থ্রোয়িং স্টোনস অ্যাট দ্য পুলিশ ফোর্স?'

'দেয়ার আর সাম মিসক্রিয়ান্টস, স্যার।'

খন্দকার শামসুদ্দিন বললেন, 'শেখ মুজিবর ইজ ক্রিয়েটিং ডিস্টারবেন্স, স্যার। দ্য ফলোয়ার অব সোহরাওয়ার্দী, দি এজেন্ট অব ইন্ডিয়া।'

৫৬ বছর বয়সী শেরওয়ানি পরা খাজা নাজিম উদ্দিন বোটের ডেকে বসেছিলেন হাওয়া খেতে। তিনি তাঁর বাটারফ্লাই গোঁফটা নাড়তে লাগলেন। শেখ মুজিবকে তিনি চেনেন। হ্যাঁ, খুবই একরোখা ভয়ংকর ধরনের ছাত্রনেতা। তবে মুসলিম লীগেরই কর্মী। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে স্লোগান তো সেদিনও দিয়েছে। কিছুদিন আগেই তাঁকে কারাগার থেকে ছাড়া হয়েছে, যখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

খাজার জন্ম আহছান মঞ্জিলে। তিনি বিলেতে লেখাপড়া করেছেন, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছেন। 'নাইটহুড' পেয়েছেন ইংরেজরাজের কাছ থেকে। অবিভক্ত বাংলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী মায় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁকে সরল-সোজা মানুষ বলেই জানত। আবুল হাশিম তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি এতই সরল যে সেটাকে বলা যায় একেবারেই বোকা। মুসলিম লীগ সরকার যখন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা বলছিল, তখন তিনি দিনাজপুরের ভূস্বামীদের এক সভায় বলেছিলেন, 'আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ক্ষুধার্ত কুকুরকে হাড়গোড় কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হয়, নাহলে তারা পুরো মাংসটাই নিয়ে যাবে; ফ্লাউড কমিশনের কাজও তেমনি।' খাজা জীবনে কোনো নির্বাচনে জয়ী হননি। চলতেন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বুদ্ধিতে।

খাজা বললেন, 'শেখ মুজিবকে ডাকো, ওকে আমার কাছে আসতে বলো। ও কেন বিক্ষোভ করছে, আমাকে বলুক। আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

শেখ মুজিব কয়েকজন কর্মী নিয়ে উঠলেন বোটে। বৈঠকে মুখোমুখি হলেন খাজার।

খাজা বললেন, 'কেন তোমরা বিক্ষোভ করছো? কারণ কী?'

মুজিব বললেন, 'আপনি জানেন না এই এলাকার মানুষ কত গরিব। এই গরিব মানুষদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে। সেই টাকা দেওয়া হবে জিন্নাহ ফান্ডে। অথচ এলাকায় একটা কলেজ নাই। এই গরিবের রক্তচোষা টাকা জিন্নাহ ফান্ডে জমা পড়লে কি কায়েদে আযমের সম্মান বাড়বে? নাকি একটা এলাকায় একটা কলেজ হলে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পাবে?'

খাজা বললেন, 'আচ্ছা, আমি এই এলাকায় একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেব কালকের সভায়। কায়েদে আযম মেমোরিয়াল কলেজ। আর সেই কলেজের ফান্ডে বাকি টাকা রেখে দেওয়া হবে।'

'থ্যাংক ইউ' বলে মুজিব বেরিয়ে এলেন তাঁর কর্মীদের নিয়ে।

লুৎফর রহমান বললেন, 'গোপালগঞ্জ এসেছ। টুঙ্গিপাড়া যাবা না?'

'এইবার আর যাই না। গোপালগঞ্জ থেকে যেতে বেশি সময় লাগে। এর চেয়ে ঢাকা থেকে যেতেই সময় লাগে কম। আর ঢাকায় অনেক কাজ, আব্বা।'

'কী কাজ করতেছ? ওকালতিটা পড়তে বলছিলাম। পড়তিছ?'

'ভর্তি তো হইছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এলএলবি পড়তিছি। সেকেন্ড ইয়ার। দেখি।'

'সাবধানে থাইকো, খোকা। তোমারে নিয়া সব সময় দুশ্চিন্তা করি। পুলিশ তো তোমার পিছনে লেইগে আছে। আবার কবে জানি অ্যারেস্ট হও।'

'দেশের মানুষের ভালো থাকার জন্য কাউরে কাউরে কষ্ট

করতে হয়, আব্বা। অন্যায় হইলে প্রতিবাদ না করলে সেইটাও অন্যায়। অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' রাতের বেলা ভাত খেতে খেতে পিতাপুত্র কথা বলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন কর্মী খেতে বসেছেন। তাঁরা মুজিবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন খাওয়া ভুলে। হ্যারিকেনের আলোয় তাঁরা দেখতে পান, গোপালগঞ্জের চরের লেঠেলদের কাঠিন্য আর পলিমাটির নরম প্রেবতা একই সঙ্গে এই যুবকের মুখে খেলা করছে।

লুৎফর রহমান বলেন, 'খোকা। চিরটা কাল আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতিছি। স্বপ্ন দেখি তুমি জজ-ব্যারিস্টার হবা। ম্যাজিস্ট্রেট-এসডিও হবা। অন্তত ভালো উকিল হলিও তো খোকা তোমার আব্বার মুখটা উঁচু হয়।'

রহমত সরদার, গোপালগঞ্জের সরদারপাড়ার ২৩ বছরের যুবক, বহুদিন থেকেই মুজিবের সংগঠনের কর্মী, এক লোকমা ভাত মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলেন, 'চাচা, আপনে চিন্তা কইরেন না। খোকা ভাইরে দেখে আসতিছি সেই ছোটবেলা থন। খোকা ভাইয়ের নিজের স্বাদ-স্বপ্ন সব আল্লাহ পুরা করে, আপনেরটেও করবা নে। কী কও, খোকা ভাই? আপনের মনে আছে না, রফিক সিনেমা হলের সামনের দোতলায় বইসে আপনেরে আমি কী বলছিলাম? বুঝলেন নাকি চাচা, খোকা ভাই তখন কলকাতা থেইকে মাঝেমইধ্যে আসেন, এই প্রত্যেক মাসের কুড়ি বাইশ তারিখে গোপালগঞ্জ আসতেন। আমাদের অ্যান্টি গ্রুপ মুকসুদপুরের সালাম খানের গ্রুপের মিটিং বড় হতো। একবার গিমাডাঙ্গা স্কুল মাঠে খোকা ভাই মিটিং দিয়েছেন। সব মিলে লোক হলো ১৭ জন। পথে আসার সময় আমি কলাম, মিয়াভাই, এত কম লোকের মিটিং কইরে কী লাভ? দিনটাই মাটি! খোকা ভাই, সেদিন কী কইছিলেন মনে আছে?'

মুজিব রহমত সরদারের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে আছে।

রহমত সরদার বলেন, 'খোকা ভাই সেই দিন বলেছিলেন, বুঝলেন চাচা, হতাশ হয়ো না। দেখবা আমার মিটিংয়ে একদিন লক্ষ লক্ষ লোক হবি নে! তো আইজকে দেখেন। হাজার হাজার মানুষ খোকা ভাইয়ের পিছনে মিছিল করতিছে। পঁয়তাল্লিশ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যেদিন এলেন, সেই মিটিংয়েও তো লক্ষ লোক হয়েছিল। নাকি হয়নি? তো, আপনার খোকা জজ-ব্যারিস্টার কেন, তার চেয়ে বড় বৈ ছোট কিছু হবে না নে। ব্যারিস্টার তো জিন্নাহ, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী সাহেব সবাই। তারা তো আবার মন্ত্রী-মিনিস্টারও হয়েছেন। আমাদের খোকা ভাইও হবি।'

মুজিব একটু যেন লজ্জিত হন। মন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন করছেন না। তিনি আন্দোলন করেন জুলুমের হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাবেন বলে। জন্মের পর থেকেই দেখে আসছেন, দেশ পরাধীন। পরাধীন দেশকে মুক্ত করতে হবে, তাঁর গৃহশিক্ষক স্বদেশি আন্দোলন করতে গিয়ে জেল খেটে আসা হামিদ মাস্টার তাঁকে শুনিয়েছেন তিতুমীর, সূর্যসেন, ক্ষুদিরামের কাহিনি; মানুষের মুক্তির জন্য, দেশকে মুক্ত করার জন্য এসব বীর কীভাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময়ে কলকাতায় নেতাজি সুভাষ বসু হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানান। তিনি সময়সীমা বেঁধে দেন ১৯৪০ সালের ৩ জুলাইয়ের মধ্যেই ওই মনুমেন্ট সরাতে হবে। শেখ মুজিব জানার চেষ্টা করেন, হলওয়েল মনুমেন্টটা কী! কলকাতা থেকে খবরের কাগজ আসে এক দিন পর, কখনো দুই দিন পর, তা-ই পড়ে পড়ে তিনি কিছুটা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে নাকি কিছুসংখ্যক ইংরেজ বন্দীকে একটা ক্ষুদ্র কক্ষে আটকে রেখেছিলেন, যাতে তারা মারা যায় শ্বাসরোধের ফলে। ওই সৈনিকদের সম্মানে হলওয়েল মনুমেন্ট স্থাপন করা ছিল কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারে। ওই মনুমেন্ট হলো পরাধীনতার চিহ্ন, ওটা সরাতে হবে—সুভাষ বসু ১৯৪০-এ ঢাকায় এলে ঢাকাবাসী নেতাজিকে বলল সেই কথা। নেতাজি বললেন, 'ঠিক আছে, ওই মনুমেন্ট সরানোর ডাক আমি দেব।' ডাক দিয়েছিলেন নেতাজি। বলেছিলেন, 'সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি দিবস ৩ জুলাইয়ের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্ট নামের কলঙ্কচিহ্ন সরাতে হবে। না হলে ৩ জুলাই আমার বাহিনীর অভিযানে নেতৃত্ব দেব আমি।' ২ জুলাই নেতাজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা বাংলায় সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গোপালগঞ্জেও এসে লাগে তার ঢেউ। স্কুলছাত্র মুজিবও যোগ দেন মিছিলে। 'হলওয়েল মনুমেন্ট, সরাতে হবে, সরাতে হবে', 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, হলওয়েল মনুমেন্ট',

কেন তোমরা বিক্ষোভ করছো? কারণ কী?

'সুভাষ বসুর মুক্তি চাই।' মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক বললেন, 'আমি সুভাষকে ভালোবাসি। শ্রদ্ধা করি। আমরা সবাই তাঁর অনুরক্ত। এ দেশের রাজনীতিতে তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। শুধু কংগ্রেস কিছু বলল না।' অথচ সুভাষ বসু পর পর দু বছর সভাপতি ছিলেন কংগ্রেসের। কিন্তু হিন্দু, মুসলিম, বাঙালি এক হয়ে গেল সুভাষের মুক্তির প্রশ্নে। ওই গোপালগঞ্জেও রব উঠল : হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, জিন্দাবাদ। সুভাষ বসু, জিন্দাবাদ।

সুভাষ বসু তখনই টানতে থাকেন মুজিবকে। এই নেতার সঙ্গে তাঁর দেখা করতে হবে। তাঁকে জানাতে হবে, তিনি চান ইংরেজদের তাড়াতে। সুভাষ বসু কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। এই সুযোগ। মুজিব চলে যাবেন কলকাতায়, সোজা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। দেখা করবেন নেতাজির সঙ্গে। নেতাজির খবর রোজ বেরোচ্ছে পত্রিকায়। ক্লাস নাইনের ছাত্র মুজিব সেসব পড়েন আর চূড়ান্ত করে ফেলেন তাঁর পরিকল্পনা। উঠে পড়েন গোয়ালন্দের স্টিমারে। গোয়ালন্দ দিয়ে ট্রেনে উঠে সোজা কলকাতা। সারা রাত ট্রেন চলল, সকালবেলা গিয়ে পৌঁছাল শেয়ালদা স্টেশনে। মুজিব ট্রেন থেকে নেমে খুঁজে-পেতে হাজির হলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে।

পুলিশ কর্মকর্তা অজয়কুমার বসু তখন সুভাষ বসুকে প্রহরাধীন ও নিরাপদ রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। মুজিব কাগজপত্র জোগাড় করে দরখাস্ত লিখলেন : 'আই হ্যাভ কাম ফ্রম গোপালগঞ্জ টু মিট নেতাজি। প্লিজ, অ্যালাউ মি টু মিট হিম।'

হাসপাতালের বড় সিঁড়ির দক্ষিণ পাশে অজয়কুমার দে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা করেন। ছেলেটির চোখে চশমা। পরিধানে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। (অজয়কুমার দের মনে হয়েছিল, ছেলেটির বয়স ১৬-১৭, যা তিনি পরে *ডাউন মেমোরি লেইন* গ্রন্থে লিখবেন। আসলে তো মুজিবের বয়স তখন ছিল ২০)

'তোমার নাম কী?' পুলিশ কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

'শেখ মুজিবুর রহমান।'

'তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?'

'ক্লাস II-এ।' (তখন নাইনকে ক্লাস II বলা হতো)

'তুমি কেন শ্রীবসুর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'আমি নেতাজির ভক্ত। তিনি মহান ভারতীয় নেতা। তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদাভেদ করেন না।'

'আচ্ছা। খুব ভালো কথা। তিনি তো ভারতবর্ষে স্বরাজ চান। তুমিও কি চাও?'

'হ্যাঁ। আমিও চাই ভারতবর্ষ শাসন করবে ভারতীয়রাই।'

'তা করতে হলে তো সংগঠন করতে হবে। তুমিও নিশ্চয়ই সংগঠন করো।'

'আমি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ করি।'

'কিন্তু তুমি তো নেতাজির ভক্ত। নেতাজির সংগঠন করো না?'

'না, আমি নেতাজির সংগঠন করি না।'

'করো নিশ্চয়ই। আমি জানি, নেতাজির সংগঠন করলে সেটা কাউকে বলতে হয় না। আমাকে বলতে পারো। কারণ আমিও নেতাজিরই লোক। আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা নাই।'

'না, আমি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগই করি। নেতাজির সংগঠন করি না। কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করি।'

'তুমি কেন সত্য গোপন করছো। নেতাজির গোপন সংগঠনগুলোর খবর আমিই রাখি। তুমি আমাকে বলো। তুমি

ফরোয়ার্ড ব্লক করো।'

মুজিব বুঝতে পারলেন, এই ভদ্রলোক আসলে পুলিশের লোক। এই অল্প বয়সেই কারাগার থেকে ঘুরে আসা মুজিব এদের সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। আর তা ছাড়া সত্যি তো মুজিব নেতাজির সংগঠন করতেন না। কিন্তু মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে সবাই তখন ভক্ত ছিল নেতাজির। ঢাকা থেকেই তো প্রথম হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ডাক আসে। ইসলামিয়া কলেজের ছেলেরাই নেতাজিকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল। তারা ধর্মঘট আর বিক্ষোভ করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপরে চড়াও হয়। লাঠিচার্জ করে। তখন তারা মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে। বেকার, কারমাইকেল আর ইলিয়ট হোস্টেলের ছেলেরা অশান্ত হয়ে উঠলে সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন হোস্টেলে চলে যান। খাজা ছিলেন ভীতু ধরনের মানুষ। গাড়ি থেকে নামেননি। ফজলুল হক গাড়ি থেকে নেমে হোস্টেলের দিকে যাত্রা শুরু করলে ছেলেরা তাঁর গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দেয় ওপর থেকে। বাতি নিভিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ফজলুল হক ভেজা কাপড়ে ছেলেদের কাছে যান। এবং ছেলেদের কথা দেন, হলওয়েল মনুমেন্ট তিনি অপসারণ করবেন। 'ছাত্রদের ওপর লাঠি চালানো মানে আমার নিজের বুকেই লাঠির ঘা বসানো। তোমরা আমার নিজের ছেলেরই মতো।' ফজলুল হক কথা রেখেছিলেন। সেই রাতের অন্ধকারেই মনুমেন্টটা অপসারণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

'না, আমি ফরোয়ার্ড ব্লক করি না। আমি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগই করি।'

পুলিশকর্তা বুঝলেন, ছেলেটা আসলেই কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে সব খবর রাখে। খুব বড় উচ্চ আদর্শ ধারণ করে আছে এই ছেলেটা তার তরুণ হৃদয়ের মধ্যে।

'তোমার আদর্শবাদিতা আমার পছন্দ হয়েছে। তোমার মতো ছেলে আজকের দিনে সত্যি বিরল। তুমি দেশে ফিরে যাও। লেখাপড়া শেষ করো। নেতাজির সঙ্গে কারও দেখা করার নিয়ম নেই। থাকলে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে তাঁকে দেখা করিয়ে দিতাম।'

মুজিব সেদিন চলে এসেছিলেন। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তো তিনি নন। তিনি জীবনে যা করবেন বলে মনস্থ করেছেন, তা তিনি করেই ছেড়েছেন।

কলকাতা তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতে লাগলেন। একদিন গেলেন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের কাছে। তাঁর বন্ধু প্রাণতোষের বাবা অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিধবা মা আর প্রাণতোষ ছাড়া তাঁদের সংসারে কেউ নেই। প্রাণতোষের মা তাঁকে ধরলেন, 'বাবা, তুমি তো মুসলিম লীগ করো, ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে তোমার তো পরিচয় আছে। তুমি না ওনার সাথে ডাকবাংলোয় দেখা করেছ। তুমি না ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সহসভাপতি। প্রাণের একটা চাকরির ব্যবস্থা তুমিই কইরে দিতে পারো, বাবা।' প্রাণতোষ আর তাঁর বিধবা মাকে নিয়ে মুজিবকে যেতে হয়েছিল কলকাতায়। দেখা করতে হয়েছিল ফজলুল হকের সঙ্গে, তাঁর ঝাউতলার বাসায়। পুলিশ কর্মকর্তা অজয়কুমার দের সঙ্গে আবার দেখা তাঁর। তিনি বললেন, 'তোমাকে পরিচিত মনে হচ্ছে? কী যেন নাম তোমার?'

'শেখ মুজিবুর রহমান।'

'কোথায় যেন বাড়ি তোমার, পদ্মার ওই পারে?'

'গোপালগঞ্জ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন এসেছিলে?'

'এই যে আমার বন্ধু প্রাণতোষের বাবা মারা গেছেন। বিধবা মাকে নিয়ে ও বড় কষ্টে আছে। ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে...'

'কী বললেন চিফ মিনিস্টার।'

'সাথে সাথে ফোন করলেন ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে। হয়ে যাবে একটা কিছু। এখন যাচ্ছি ওখানে।'

তো, সেবার প্রাণতোষকে নিয়েই ব্যস্ততা গেল। পরের বার, হ্যাঁ পরের বার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ির সামনে মুজিব ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। নেতাজি তখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ওই বাড়িতে গৃহবন্দী। ফাঁক খুঁজতে লাগলেন, নজরদারিতে একটু শিথিলতা নিশ্চয়ই হবে। ধোবা, ফেরিওয়ালারা তো বাড়িতে যাচ্ছে আসছে। এক ফাঁকে মুজিব ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতরে। আরও দর্শনার্থী ছিল তখন ওই ঘরে। কথা তেমন হয়নি।

'আমি আপনার আদর্শের একজন ভক্ত, আপনার সঙ্গে দেখা করতে গোপালগঞ্জ থেকে এসেছি। গোপালগঞ্জ স্কুলে পড়ি। আপনার আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা জানাতে এসেছি।' মুজিব বললেন।

নেতাজি বলেছিলেন, 'তোমার মতো তরুণেরাই তো দেশের আশা। তুমি চলে যাও। পুলিশ দেখে ফেললে তোমাকে অযথা অ্যারেস্ট করবে। হয়রানি করবে।'

'আশীর্বাদ করবেন। নমস্কার।' মুজিব বেরিয়ে এলেন।

তখনই আবার নজরে পড়ে গেলেন অজয়কুমার দের। পুলিশের কাজই সন্দেহ করা। শেখ মুজিবকে অনুসরণ করে অজয় দে পোস্ট অফিস পর্যন্ত গেলেন। তাঁকে বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান না?'

'জি।'

'নেতাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এটা আমার একটা স্বপ্ন ছিল, আমি একবার নেতাজিকে কাছ থেকে দেখব। সাক্ষাৎ হয়েছে।'

'কেন সাক্ষাৎ করলে বলো তো?'

'আমি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সলিডারিটি প্রকাশ করলাম।' সহজভাবে বললেন মুজিব। পুলিশকর্তা অজয়কুমার দেও সহজভাবেই নিলেন বলে মনে হলো। তিনি আর কিছু বললেন না। মুজিবও বিদায় নিলেন।

সত্যি, বড় আদর্শই মুজিবকে টেনে এনেছে রাজনীতিতে। জজ-ব্যারিস্টার মন্ত্রী-মিনিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনীতি করছেন না।

রাতের খাওয়া সারা হয়ে গেলে কর্মীদের বিদায় নিলেন মুজিব। সবাই যার যার বাড়িতে, হোস্টেলে চলে গেল। মুজিব আর লুৎফর রহমান বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

•

পরের দিন গোপালগঞ্জ টাউন মাঠে খাজা নাজিম উদ্দিনের জনসভা। পাকিস্তান মিনার উদ্বোধন শেষে এই জনসভায় তিনি বক্তৃতা করতে ওঠেন। তিনি ঘোষণা দেন, 'এই মহকুমা শহরে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। কলেজের নাম হবে "কায়েদে আযম মেমোরিয়াল কলেজ"। এই কলেজের ফান্ডে আমি আপনাদের চাঁদার দুই লাখ টাকা তহবিল এখন থেকেই জমা করে গেলাম। বাকি খরচ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হবে।'

'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ', 'খাজা নাজিম জিন্দাবাদ' স্লোগান আসতে থাকে মঞ্চ থেকে।

জনতাও সেই জিন্দাবাদ-ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়।

অচিরেই সেই স্লোগান 'শেখ মুজিবর জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

৪.

ব্যাঙ্গমা বলে, দুইজন আলাদা আলাদাভাবে কাজ কইরা চলছে।

ব্যাঙ্গমি বলে, আমি জানি দুইজন কে?

ব্যাঙ্গমা বলে, কও তো কে?

ব্যাঙ্গমি বলে, তুমি কও।

ব্যাঙ্গমা বলে, শেখ মুজিব আর তাজউদ্দীন। শেখ মুজিব পাকিস্তান হওয়ার প্রথম দিন থাইকাই জানেন, এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা না। আরেকটা স্বাধীনতার জন্য তাঁর লড়াই শুরু হইল মাত্র। বেকার হোস্টেলে ছাত্রকর্মীদের ডাইকা তিনি এই কথা বলছিলেন। আর অনেক পরে, একই কথা কইবেন অন্নদাশংকর রায় নামের এক বিখ্যাত লেখককে। তত দিনে বাংলা স্বাধীন হইয়া গেছে। শেখ সাহেব তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। অন্নদাশঙ্কর রায় জিগাইলেন তাঁরে, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এল?'

'শুনবেন?' মুচকি হাসি দিয়া শেখ মুজিব কইলেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি আর শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন তাঁরা। কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কেউ রাজি নয় এই প্রস্তাবে। আমিও দেখি যে উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে শুরু করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা। হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল। বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ

করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে পাক-বাংলা, কেউ বলে পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না, বাংলাদেশ।'

ব্যাঙ্গমি বলে, হ্যাঁ, এই তো সেই দিন, নারায়ণগঞ্জ ছাত্রলীগের সম্মেলনে তিনি পূর্ব বাংলাকে বাংলাদেশ বইলা ডাকেন।

ব্যাঙ্গমা বলে, আর তাজউদ্দীন, গত বছরেই, ২৯ মার্চ ৪৮, বিকেলবেলা কার্জন হলে ছাত্রনেতা অলি আহাদ, নাঈমউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা-তর্কবিতর্কে মাইতা উঠলেন। তাজউদ্দীনের কথা হইল, আদৌ স্বাধীনতা পাওয়া যায়নি। অলি আহাদ সেইটা মানতে চাইলেন না।

ব্যাঙ্গমি বলল, শেখ মুজিব কইরা চলল মিছিল-মিটিং আন্দোলন-সংগ্রাম। জেল-জুলুম, পুলিশের লাঠির বাড়ি কিছুই তারে দমাইতে পারে না। তার ওপরে তাঁর রাগ আরও বাড়ছে, তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সরকারের একের পর এক চক্রান্তের কারণে।

ব্যাঙ্গমা বলল, আর তাজউদ্দীন কইরা চলল পেপার ওয়ার্কস। নানা রকমের মেনিফেস্টো তৈরি করা, পুস্তিকা ছাপানো, মুসলিম লীগ না নতুন দল, এই সব তর্কবিতর্কে রইল মাইতা। শেখ মুজিব যেইখানেই যায়, লোকে তাকে ঘিরা ধরে। তাজউদ্দীন কাজ করে টেবিলে টেবিলে, ঘরের মধ্যের আলোচনায়। তবে তার এলাকায়ও যায়। সভা করে। ঢাকাতেও সভাসমিতি আলোচনা দেনদরবারে অংশ নেয়।

ব্যাঙ্গমি বলল, ইতিহাস দুইজনরে এক করব। আরও পরে।

বাতাস ওঠে। আমগাছের পাতা নড়ে, শাখা দোলে। আমের গাছে মুকুল এসেছে। মুকুলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি সেই গন্ধভরা বাতাস বুক ভরে টেনে নেয়। তাদের ভালো লাগে।

৫.

শেখ মুজিবের মন খারাপ। বস্তুত ১৫০ মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সবারই মন খারাপ। হাশিমপন্থী বা সোহরাওয়ার্দীপন্থী বা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের অনেকেই আজ বিষণ্ণ। সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে।

কেবল সোহরাওয়ার্দীর পরিষদ সদস্যপদ বাতিল করার জন্য গণপরিষদের সদস্যপদে থাকার যোগ্যতার বিধি সংশোধন করা হয়। এ আইন যেদিন করাচিতে পাস হয়, সেদিন মাঘের সেই শীতার্ত দিনটিতে সোহরাওয়ার্দী নিজে উপস্থিত ছিলেন অধিবেশনে। বিতর্কে তিনি অংশও নিয়েছিলেন।

গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'মাননীয় স্পিকার, জীবন থাকতে কোনো ব্যক্তির নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার অথবা নিজের শোকসভায় ভাষণ দেওয়ার সুযোগ হয় না।...সম্ভবত এই আমার শেষ ভাষণ। বলা হচ্ছে যে আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তাই আইনের এই সংশোধনীগুলো করা হচ্ছে। এই আইন মানুষের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছে অস্পষ্ট। আমার মতো একজন নিরীহ ব্যক্তিকে গণপরিষদ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য উপস্থাপিত এইরূপ বিবরণ বিশ্বাস করতে আমি অস্বীকার করছি। যে রাষ্ট্র পৃথিবীর ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর প্রধান হতে চায়, যেখানে ন্যায়বিচার ও সহিষ্ণুতা থাকবে, সে রাষ্ট্র তার আইনবিষয়ক ক্ষমতা, তার দলীয় শক্তি, তার সরকার, তার দলীয় শৃঙ্খলা পরিচালিত করবে কেবল একজন মাত্র ব্যক্তিকে দূর করার জন্য, যার একমাত্র অপরাধ হলো এ গণপরিষদে সংখ্যালঘুর পক্ষে কথা বলা।'

স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন। কী প্রস্তাব? যে ব্যক্তি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা নন, গত ছয় মাসেও যিনি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারেননি এবং যিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন না, তিনি সদস্য থাকতে বা নির্বাচিত হতে পারবেন না।

একে একে সদস্যরা উঠে ভোট দিতে গেলেন। কেউ সোহরাওয়ার্দীর মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। কারণ সোহরাওয়ার্দী কিছুদিন আগেও ছিলেন এঁদেরই মুখ্যমন্ত্রী, এঁদেরই নেতা। তিনি ২৭টা বছর আইনসভায় সদস্য ছিলেন। এই সদস্যদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে তাঁর কাছে ঋণী। তিনি একাকী একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

স্পিকার ভোটের ফল ঘোষণা করলেন।

আইনটি পাস হলো।

পরের দিন গণপরিষদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হলো, সরকার এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের আসন শূন্য ঘোষণা করছে। সেটা করা হলো আইন প্রণয়ণের মাসখানেক পরে, ২ মার্চ ১৯৪৯। সেই খবর ঢাকা এসে পৌঁছায়।

শেখ মুজিব চিৎকার করে ওঠেন, 'এই পরিষদে বহু সদস্য আছেন যাঁদের পাকিস্তানে বাড়ি নাই। কারও সদস্যপদ বাতিল হলো না, আর শুধু আমার লিডারের পদ বাতিল হলো! এই সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রবিরোধী খাজা-লিয়াকত সরকারের বিরুদ্ধে আজ থেকে শুরু হলো আমার ডাইরেক্ট অ্যাকশন।'

মোগলটুলির কর্মীরা যে যাঁর বিছানা ছেড়ে এসে মুজিবকে ঘিরে ধরেন।

৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা ছেড়ে করাচিতে চলে আসেন। ওঠেন তাঁর ভাই শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বাসায়।

শুধু সোহরাওয়ার্দী নন, এর আগে মওলানা ভাসানীর পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্যপদও গভর্নর এক নির্দেশবলে বাতিল করে দেন।

তিনি ঢাকার ১৫০ মোগলটুলিপন্থীদের নির্দেশ দেন বিরোধী দল গঠন করতে। কামরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ কাজ খুঁজে পান।

৬.

১৫০ মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে মুজিব ছটফট করছেন। তাঁর চোখে ঘুম নেই। এ রকম সাধারণত হয় না। সারা দিনের মিছিল-মিটিং শেষে ঘরে ফিরে ক্লান্ত মুজিব চোখ বন্ধ করলেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যান। আজ রাতে তা হচ্ছে না। এমনিতেই চৈত্র মাস। খুব গরম পড়েছে। হাতপাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাত ব্যথা হওয়ার জোগাড়। গরম তো অন্য রাতেও পড়ে। তখন তো হাতপাখা ঘোরাতে হয় না। ঘুমিয়ে পড়লে গরমই কী আর ঠান্ডাই কী।

একটা সিদ্ধান্ত তাঁর নেওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। তাঁকে ১৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আর মুচলেকা দিতে হবে, এর পর থেকে তাঁর আচরণ ভালো করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই নোটিশ দিয়েছে।

তিনি নোটিশটা আবার বের করেন। পকেটে থাকতে থাকতে ঘামে ভিজে কাগজের ভাঁজ প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে গেছে। টেবিলের ওপর হ্যারিকেন তুলে আলো বাড়ান। বিড়বিড় করে পড়তে থাকেন :

> ...that the following attached students be fined Rs. 15/- each and be allowed to continue as attached students to the condition that they furnish individually a guarantee of good conduct endorsed by their gurdians in the prescribed form to the relevant provost on or before the 17th April, 1949.
>
> 1. Sk. Mujibur Rahman II year LLB Roll 166 S.M.H

২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক দবিরুল ইসলাম, অলি আহাদসহ ছয়জনের শাস্তি হয়েছে চার বছরের বহিষ্কারাদেশ; ডাকসুর ভিপি অরবিন্দ বসুসমেত ১৫ জনের বিভিন্ন হল থেকে জরিমানা; নঈমুদ্দিন আহমেদ, ওই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় ও তুখোড় ছাত্রীকর্মী নাদেরা বেগমসমেত শেখ মুজিবের ১৫ টাকা জরিমানা; আর একজন ছাত্রী লুলু বিলকিস বানুর ১০ টাকা জরিমানা। সে হিসাবে মুজিবের শাস্তিই হয়েছে কম। একটা মুচলেকা আর ১৫টা টাকা দিয়ে দিলেই সবকিছু ঠিক থাকে। সবকিছু ঠিক থাকবে? মুজিবুর রহমান মুচলেকা দিয়ে পড়াশোনা করবেন? সদাচরণের জন্য মুচলেকা দিতে হবে? তার মানে কি তিনি এত দিন যা করে এসেছেন তা অসদাচরণ?

কী করেছিলেন তাঁরা?

তোমাকে না বললাম অ্যারেস্ট হবা না

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা অনেক দিন ধরেই তাঁদের দাবিদাওয়া আদায়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আসছিলেন। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তাঁরা ধর্মঘটে যান। তাঁদের সমর্থনে ছাত্ররাও ক্লাস বর্জন শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছাত্রধর্মঘটের ডাক দেয়। মিছিল, সভা, সমাবেশে যোগ দিতে থাকেন ছাত্ররা। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্ররা ছিলেন সেই আন্দোলনের সংগঠক। নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অবস্থা আসলেই ছিল মানবেতর। ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত বেতনকাঠামোয় তাঁরা ঠিক মানুষের মর্যাদাভুক্ত ছিলেন না। যেকোনো মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষই এই কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সমর্থন করবে।

কিন্তু সরকারের আসল ভয় ছিল আসন্ন বাজেট অধিবেশন। ওই অধিবেশন চলার সময় যেন কোনো ছাত্রবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে না পারে, তাই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তা-ই হয়। ডাইনিং বন্ধ করে দেওয়া হয় হলে হলে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী হল ত্যাগ করে চলে যায়। তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। সব কলকাঠি আসলে পেছন থেকে নাড়ছিলেন তিনি। এই নুরুল আমিনের ধমকে মুজিবুর রহমান মুচলেকা দেবেন?

তখনই মনে পড়ে যায় আব্বার মুখ। তিনি আশা করে আছেন ছেলে জজ-ব্যারিস্টার না হোক, অন্তত অ্যাডভোকেট হবে। মনে পড়ে যায় রেনুর মুখ। তিনিও আশা করে আছেন, মুজিব পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন, হাসু আর তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসবেন। তাঁদের নিজেদের সংসার হবে।

না। একবার আপস করলে আর ঘুরে দাঁড়ানো যাবে না। ছাত্রকর্মীদের মন ভেঙে যাবে। তাঁর মিশন তো কেবল অ্যাডভোকেট হওয়া নয়। তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন আর সুভাষ বোসের জীবনকাহিনি তো এই পরামর্শ দেয় না। একবার পেছাতে শুরু করলে পেছাতে থাকতেই হবে।

সবচেয়ে ভালো হলো আন্দোলন দুর্বার করে তোলা। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। আন্দোলনের তোড়ে ভেসে যাবে সব শাস্তিনামা।

মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি মুচলেকা দেবেন না। যা হয় হবে। মনে পড়ল, রেণু তাঁকে বলেছেন, তিনি যেন তাঁর নিজের মিশন পারিবারিক পিছুটানের কারণে পরিত্যাগ না করেন।

ছাত্রনেতারা বসলেন সবাই। ১৭ এপ্রিল ছাত্রধর্মঘট ও ছাত্রসভা আহ্বান করা হলো। মুজিব তাঁর বড় সংগঠক। সঙ্গে আছেন অলি আহাদ। কিন্তু এর মধ্যে অনেকেই, গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা মুচলেকাপত্র জমা দিয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে গেছেন। এটা আন্দোলনের ক্ষতি করল। তবু মুজিব টলবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন ধর্মঘট পালিত হলো। সভায় ছাত্র ও কর্মচারীরা যোগ দিলেন বিপুল সংখ্যায়। সেই সভা থেকে মিছিল; সেই মিছিল নিয়ে শেখ মুজিব, অলি আহাদ প্রমুখ গেলেন উপাচার্যের বাসভবনে। সরকারের, শিক্ষা বিভাগের, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিরা বসলেন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে। আলোচনা আশাব্যঞ্জক বলেই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু সরকার থেকে বলা হচ্ছিল যেন এই শাস্তি মওকুফ না করা হয়।

শেখ মুজিব সব বুঝতে পারলেন। তিনি অলি আহাদকে আহ্বায়ক বানালেন ছাত্র কর্মপরিষদের। এর আগের আহ্বায়ক এরই মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন। ২০ এপ্রিল ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, ২৫ এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হলো।

শেখ মুজিব বললেন, 'চুপ করানো চলবে না। আমরা অবস্থান ধর্মঘট করব ভিসির বাড়ির সামনে।'

অবস্থান ধর্মঘট আর হরতালের খবরে ভিসির বাড়ির সামনে পুলিশ এসে বোঝাই হয়ে গেল। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনও ঘোরাফেরা করতে লাগল চারদিকে। শেখ মুজিবের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এসব ব্যাপারে অতি শক্তিশালী। তিনি বুঝলেন, এর পরের পর্ব হলো গ্রেপ্তার অভিযান। অলি আহাদকে ডেকে বললেন, 'শোনো, তুমি ছাত্র কর্মপরিষদের সভাপতি। তোমার অ্যারেস্ট হওয়া চলবে না। খবরদার, গ্রেপ্তার হবা না! সাবধানে থাকবা। রাতে হলে থাকবা না। তুমি অ্যারেস্ট হওয়া মানে কিন্তু আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়া।' অলি আহাদ, মুজিবের চেয়ে বয়সে আর অভিজ্ঞতায় ছোট, বললেন, 'জি আচ্ছা, মুজিব ভাই।'

১৯ এপ্রিল। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে অবস্থান ধর্মঘট। বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল এসে ভরে তুলছে ভিসির বাড়ির সম্মুখভাগ। ধর্মঘটীদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন মুজিবুর রহমান।

সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলে।

প্রথমে গোয়েন্দা অফিসে, তারপর তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে ঠাঁই হলো মুজিবের। কারাগারে যাওয়ার তাঁর অভ্যাস আছে। এটা নতুন কিছু নয়। পরের দিন সকালবেলা তিনি জেল কর্মচারীদের বললেন খাম, কাগজ, কলম দিতে। তিনি চিঠি লিখবেন।

তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরটা আব্বাকে আর রেনুকে জানানো দরকার।

জানানো দরকার যে তিনি ভালো আছেন

বিকেল হতে না হতেই ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এসে হাজির অলি

আহাদ।

মুজিব তাঁকে দেখেই বকাবকি করতে লাগলেন, 'অলি আহাদ, এইটা কোনো কাজ করলা! মিয়া, তোমাকে না বললাম অ্যারেস্ট হবা না। তুমি অ্যারেস্ট হয়ে চলে আসলা। এখন আন্দোলনের কী হবে?'

অলি আহাদ বললেন, 'আরে, আমি ইচ্ছা করে অ্যারেস্ট হয়েছি নাকি! চারদিকে গোয়েন্দা। কালকে রাতটা তো ওদের চোখে ধূলা দিতে পেরেছি। আজকে তো পুলিশের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়েছে। জিমনেশিয়াম মাঠে আমরা সভা করেছি। তারপর মিছিল। মিছিল ঢাকা হলের দিকে যাওয়ার পথেই পুলিশ আক্রমণ করে বসল। লাঠিচার্জ করল। কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল। আমার সঙ্গে তো রীতিমতো হাতাহাতি ধস্তাধস্তি। ওইখান থেকেই আমাকে অ্যারেস্ট করেছে। কিছু করার আছে? আমার কোনোই দোষ নাই।'

মুজিব বললেন, 'এখন আন্দোলন পরিচালনা করবে কে? লিডার লাগবে না? একজনকে বাইরে থাকতে হয়। আমি ভেতরে, তুমি বাইরে, এইটা হলে না হয় আন্দোলন হয়!'

ঠিক। দুইজনে কারাগারে থাকলে আন্দোলন হয় না। ব্যাঙ্গমা বলল, কলাভবনের সামনের আমগাছে বসে, ওই সময়ে অলি আহাদের সঙ্গে মুজিবের বনতেছিল ভালো।

ওই বছরের জানুয়ারিতে মুসলিম ছাত্রলীগ, যাকে মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সদস্যরা সমর্থন করতেন, হল ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। সলিমুল্লাহ হলের ১২ নম্বর কক্ষে তাদের সভা বসে। ওইটা ছিল অরগানাইজিং কমিটির সভা। তাতে অলি আহাদ প্রস্তাব করেন, 'মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন করা দরকার। মুসলিম ছাত্রলীগ থাইকা 'মুসলিম' শব্দটা বাদ দেওন দরকার। তাইলে সব ধর্মের ছেলেমেয়েরা এই সংগঠনে আসতে পারব। কিন্তু সেই প্রস্তাব পাস হয় না।' শেখ মুজিব কইলেন, 'অহনও সময় হয় নাই।'

তখন রাগ কইরা অলি আহাদ পদত্যাগপত্র লেইখা জমা দেন।

শেখ মুজিব সেই পদত্যাগপত্রটা নিয়া ছিঁড়া ফেলেন।

অলি আহাদ কইলেন, 'মুজিব ভাই, খালি আপনার ভালোবাসা, আমার প্রতি দুর্বলতা আর দরদের কারণে আমি এইটা উইথড্র করতেছি।'

শেখ মুজিব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা আমাকে ভালোবাসো, এই জন্যই তো আমি তোমাদের মুজিব ভাই।'

ব্যাঙ্গমি বলল, মুজিব তহন এই আন্দোলনে অলি আহাদরে বাইরে রাখতে চাইছিল। থাকলে আন্দোলন হইত। সেইটা আমরা ইতিহাসে পরে দেখুম। মুজিব জেলে আছিল, তাজউদ্দীন জেলের বাইরে। স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হইছিল।

ব্যাঙ্গমি বলল, অহন মুজিবও জেলে, অলি আহাদও জেলে, বাকিরা মুচলেকা দিয়া দিছে, ২৫ এপ্রিলের হরতাল ভালো হইল না। ২৭ এপ্রিল থাইকা ইউনিভার্সিটির ক্লাসও তাই চলতে লাগল ঠিকঠাক।

ব্যাঙ্গমা বলল, আর মুজিবের ছাত্রত্ব গেল ঘুইচা।

ব্যাঙ্গমি বলল, সেইটা ভালোই হইল। পরে কামরুদ্দীন আহমদ সাহেব লিখব, 'জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হলো না।' আমার নিজের ধারণা, তার ওই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বাস্তব আর সময়োপযোগী হয়েছিল। তিনি তখন জননেতা হওয়ার পথে—তার আর ছাত্র থাকা শোভা পাচ্ছিল না।

৭.

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৫ নম্বর ওয়ার্ডটিতেই জায়গা হলো এই রাজবন্দীদের, যাঁদের কারাগারের লোকেরা ডাকত সিকিউরিটি বলে, আইনের ভাষায় সিকিউরিটি প্রিজনার। এর আগে সিকিউরিটি বলতে এই কারাগারের সেপাই-পাহারাদার-কর্তারা আর হাজতি ও কয়েদি বন্দীরা বুঝত কমিউনিস্টদের, যাদের শরীর হবে দড়ি-পাকানো, হাড্ডিসার, পরনে থাকবে জেলের তৈরি হাফহাতা শার্ট আর পাজামা, পায়ে থাকবে জেলের তৈরি কাঁচা চামড়ার বেঢপ স্যান্ডেল এবং পাকিস্তান তথা ইসলামের শত্রু যাদের বেশির ভাগ সময়েই আটকে রাখা হবে বদ্ধ ঘরে। কিন্তু এখন যাঁরা আসছেন, শেখ মুজিব, অলি আহাদ, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আবদুল মতিন, মাজহারুল ইসলাম, মফিজউল্লাহ—আরও অনেকে, এঁরা সবাই ছাত্র-যুবা, এঁরা কমিউনিস্ট নন, অন্তত সবাই নন, এঁরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান, মুসলিম লীগই করতেন একসময়, এখন মুসলিম ছাত্রলীগের সরকারবিরোধী অংশের নেতা-কর্মী। এঁরা দেখতে ঠিক কমিউনিস্টদের মতোও নন।

শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো বন্দী হওয়া ছাত্র-যুবকর্মীদের ডাকলেন। বললেন, 'শোনো, জীবনের প্রথম জেল তো তোমাদের। তোমাদেরকে কিছু কিছু জেলের নিয়ম-কানুন শিখায়া দিই। প্রথমেই তোমাদের ওজন নিতে আসবে। সবাই যেইটা করো, পকেটে ইটের টুকরা, পাথর, যা পাও, ভরায়া লও, ওজনটা বেশি দেখাইতে হবে। ১৫ দিন পরে যখন ওজন নিতে আসবে, তখন আর পকেটে ইট রাখবা না। যে ওজনটা কমবো সেইটা পূরণ করার জন্য ডাক্তার তখন এক্সট্রা স্পেশাল ডায়েট দিবে।'

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। 'আর তোমাদের খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোনো অসুবিধা যাতে না হয় সেইটা আমি দেখতেছি।'

মুজিব প্রতিটা কর্মীর নাম জানেন। তাদের নাম ধরে ধরে ডাকেন। এখন সব বন্দীর নামও তিনি মুখস্থ রাখছেন। সবার খোঁজখবর রাখছেন।

নুরুল আমিন সরকারের কারাগারমন্ত্রী মফিজউদ্দিন আহমদ এলেন কারাগার পরিদর্শনে। তিনি এলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

'কী খবর, মুজিবর সাহেব, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?' মন্ত্রী বললেন।

শেখ মুজিব তাঁর চোখ থেকে চশমাটা খুলে বললেন, 'হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা।'

জেলারসহ সব কর্মকর্তা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। মুজিবের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা ঘটানোর সাহস কারাগারে তো কারও হওয়ার কথা না! 'না স্যার, আপনাকে তো আমরা...' জেলারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুজিব বললেন, 'আমার ছেলেরা কম খেয়ে, না খেয়ে থাকবে আর আমি একা একা ভালো খাব ভালো থাকব, এইটা তো হয় না। আমার সব ছেলেকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদির মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৪০ সালের সিকিউরিটি প্রিজনারস রুলস অনুসারে রাজবন্দীদের যেসব সুবিধা দেওয়া হতো, জালেম মুসলিম লীগ সরকার সেসব মানছে না। বেশির ভাগ রাজবন্দীকে তৃতীয় শ্রেণীর হাজতির স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এরা তো সব মারা যাবে! আর একটা রাজবন্দীর যদি কিছু হয়, মুজিবুর রহমান সেটা সহ্য করবে এটা যেন নুরুল আমিন সাহেব না ভাবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'ওয়েল, মুজিবর সাহেব। আমি আপনার কর্মীদের সবাইকে ফার্স্ট ক্লাস স্ট্যাটাস দেওয়ার অর্ডার দিচ্ছি। ওনাদের খাওয়া-দাওয়া, পেপার-পত্রিকা, চিঠিপত্র আর যেসব ব্যাপার আছে, জেলার সাহেব, আপনি সব দেখবেন।'

কারাগারে পত্রিকা আসে সেন্সরড হয়ে। পত্রিকার পাতার কোনো কোনো অংশ কাঁচি দিয়ে কাটা থাকে। যে অংশ থাকে না, তা জানার জন্য বন্দীদের হৃদয় আঁকুপাঁকু করে।

চিঠিপত্র আসে, তাও সেন্সরড।

রেনুর একটা চিঠি এসেছে। তাতে রেনু লিখেছেন, 'আল্লাহর রহমতে তুমি আবার পিতা হইতে চলিয়াছ। এখন ৬ মাস চলিতেছে। হাসু এখন অনেক কথা বলে। বাবা বলা শিখিয়াছে। আমরা সকলে ভালো আছি। আব্বা ও আম্মার শরীর ভালো। তুমি আমাদের লইয়া চিন্তা করিবা না।'

এই পর্যন্ত চিঠিটা আনসেন্সরড ছিল। এর পরে কালি মেরে কয়েক লাইন ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কারাগারবাসে অভিজ্ঞ মুজিব জানেন, এই লাইনগুলোয় আছে অনুপ্রেরণাদায়িনী কথামালা। হয়তো রেনু লিখেছেন, 'তুমি এই জালিম সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়ছো, তাতে আমাদের মাথা উঁচু হইয়াছে। দেশের জন্য লড়িতেছ, তাহা আমাদের গৌরবেরই ব্যাপার। তুমি বড় দিবা না!'

কী জানি, কী লিখেছেন রেনু! পড়া তো আর যাচ্ছে না। ওই লাইন কটা পড়ার জন্য মুজিবের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি কাগজে তেল লাগালেন। তারপর রোদের উল্টো দিকে ধরে পড়ার চেষ্টা করলেন। এমনিতেই চোখে কম দেখেন, তার ওপর আবার এই জ্বালা।

হঠাৎ কানে এল কোকিলের ডাক। বৈশাখ মাসে কোকিল ডাকছে কোত্থেকে! তিনি এদিক-ওদিক তাকান। ওই যে বাইরের

উঁচু প্রাচীর। তার ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। প্রাচীরের ওই পারে গাছ আছে কিছু। তার কোনোটিতে বসেই কি কোকিল ডাকছে?

রেনু আবার সন্তানসম্ভবা। এই সময় তাকে কি একবার দেখতে যাওয়া মুজিবের উচিত ছিল না?

আজ মুজিবের 'দেখা' আসবে। মানে তার কাছে আসবে দর্শনার্থী। অনেকেই আসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এরই মধ্যে ঢাকা শহরে তিনি কম ভক্ত-সমর্থক তৈরি করেননি।

তাঁদের ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে তিনজন আছেন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো। শামসুল হক, ফজলুল কাদের চৌধুরী আর শেখ মুজিব। ফজলুল কাদের চৌধুরী মন দিয়েছেন ব্যবসার কাজে। ফলে রাজনীতির নেতৃত্ব দেওয়ার দৌড়ে তিনি আর নাই। সামনে আছেন শুধু শামসুল হক সাহেব। তিনি আগেই ছাত্রত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন রাজনীতি করে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্ব সুদৃঢ় হওয়ার পথে।

কিন্তু ভক্ত-সমর্থক মুজিবেরই বেশি। এর কতগুলো কারণ আছে। **মুজিব সবাইকে আপন করে নিতে জানেন। সবার সুখদুখের খবর রাখেন। সবার নামধাম তাঁর মুখস্থ। একবার কারও সঙ্গে পরিচয় হলে তাকে তিনি জীবনেও ভোলেন না।** আর তিনি হলেন বাস্তবধর্মী। কোনো আকাশকুসুম চয়নের স্বপ্ন তাঁর মধ্যে নাই। তিনি জানেন, আজকের সমস্যাটা সমাধানের জন্য আজকের লড়াইটা করতে হবে। মিছিলে যেতে হবে, সভা ডাকতে হবে, ভাষণ দিতে হবে, লড়াই করতে হবে; লাঠির বাড়ি, টিয়ারগ্যাস খেতে হবে; ভয় পেলে চলবে না। ভয় পেয়ে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের পারিবারিক বন্ধনকে বড় করে দেখলে আর যা-ই হওয়া যায়, নেতা হওয়া যায় না। নেতা মানে যে নেয়, সে নয়। নেতা তিনি, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন, যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না।

ফলে তাঁর গুণগ্রাহী অনুসারীরা তাঁকে দেখতে আসেন প্রায়ই।

কিন্তু আজ ভিজিটরস রুমে গিয়ে দেখলেন লুৎফর রহমান সাহেব বসে আছেন। তাঁর পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা।

আব্বার সামনে দাঁড়াতে মুজিবের একটু দ্বিধাই হচ্ছিল। কারণ আব্বা সেদিনও বলেছেন তাঁর স্বপ্নের কথা। তিনি চান মুজিবুর এলএলবি পড়াটা শেষ করুক। কিন্তু এরই মধ্যে ওই ঝামেলা চুকেবুকে গেছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেননি। মুচলেকা দেননি। ফলে তিনি এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন।

আব্বা খাবার এনেছেন। মা দুধ-নারকেল দিয়ে পিঠা বানিয়ে দিয়েছেন।

'বাবা, খোকা। কেমন আছো, খোকা?'

'ভালো আছি, আব্বা। আপনারা কেমন আছেন?'

'আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছে?'

'নাসের কেমন আছে? হেলেন?'

'ভালো আছে, বাবা। সবাই ভালো আছে।'

'মার শরীরটা ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা, আছে।'

'রেনু কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'হাসু কথা বলতে পারে।'

'হ্যাঁ। সারাক্ষণ দাদা দাদা বলে ডাকে। আমি যখন বাড়ি যাই আমার কোল থেকে নামতে চায় না।'

'আব্বা, আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা চাওয়ার আছে। আমি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছি। এলএলবি পড়া বোধহয় আর আমার জীবনে হলো না। ওরা আমাকে বন্ডসই দিতে বলে। আপস করতে জানলে তো আমাকে জেলেও আসতে হয় না। আপনাদেরও এত কষ্ট দিতাম না।'

'বাবা, খোকা। আমরা শুধু চাই তুমি ভালো থাকো। তোমার জানি কোনো কষ্ট না হয়। তোমার যেটা সুবিধা হয় তুমি সেটা করবা। তোমার অন্তরে যেটা চায় সেটা করবা। শুধু ন্যায়ের পথে থাকবা। অন্যায় করবা না। তাইলেই আমরা সুখী।'

'আব্বা, দোয়া করবেন আব্বা। মাকে বলবেন যেন বেশি পরিশ্রম না করে।'

'দেখা'র সময় ফুরিয়ে আসে। লুৎফর রহমানকে বিদায় নিতে হয়।

মুজিব হাসিমুখে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে পিতাকে বিদায় জানান। আব্বা যাওয়ার আগে ছেলের হাতে গুঁজে দেন কিছু টাকা। ছেলেও সেটা অলজ্জিত ভঙ্গিতে নিয়ে নেন।

টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি ভেতরে চলে যায়। মুজিব ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সবাইকে ডেকে বাটি দিয়ে দেন। সবাই মিলে খাও।

'মুজিব ভাই, খাবার এসেছে আপনার কাছে। আপনার মা রান্না করে পাঠিয়েছেন। মায়ের হাতের রান্না অবশ্যই আপনার আগে মুখে দিতে হবে।' আবদুল মতিন বলেন।

মুজিব সেই পিঠাটার একটা অংশ ভেঙে মুখে দেন। তাঁর হঠাৎই টুঙ্গিপাড়ার কথা মনে পড়ে। রেনুর কথা, মার কথা। এই যে দুধ-নারকেলের পিঠা, এই নারকেল পাড়াতে হয়েছে গাছ থেকে, কুরতে হয়েছে; কে কুরেছে, হয়তো রেনুই; তখন হয়তো হাসু তার কোলের মধ্যে বসা; উঠোনে বসে এই গ্রীষ্মের গরমে ওরা কাজ করছে; ওদিকে ঢেঁকিতে শব্দ উঠছে একটানা, নরম চালের ওপরে ঢেঁকি পড়ছে, আটা বেরোচ্ছে সাদা সাদা, মা সেই আটা ঢেঁকির মুখ থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন...

কী জানি কেন, মুজিবের মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা, যেদিন তিনি—বালকবেলায়—মধুমতী নদী পেরিয়ে তাঁর মিতা খোকা কাজিসমেত চলে গিয়েছিলেন মোল্লার হাট থানার বড়বাড়িয়াতে। আব্বাসউদ্দীন গান করবেন মুসলিম লীগের সভায়। সভায় স্পিকার তমিজউদ্দিন খান ছিলেন। আব্বাসউদ্দীন গান করবেন। ঘোষণা হলো। এক মওলানা সাহেব তাঁর পাগড়িটা খুলে ভালোমতো কানে পেঁচালেন, যাতে গানের সুর তাঁর কানে প্রবেশ না করে। প্রথমে আব্বাসউদ্দীন গাইলেন 'বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে...', পরের গান তিনি ধরলেন 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই...' গানের মাঝে তিনি 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে জিকিরের মতো করতে লাগলেন। মাওলানা সাহেব তখন কান থেকে পাগড়ি সরালেন।

সেই তমিজউদ্দিন খান এখন স্পিকার, তাঁরই সভাপতিত্বে পরিষদের বৈঠকে লিডার সোহরাওয়ার্দীর সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে।

তবে লিডার পাকিস্তানে চলে এসেছেন। ভাইয়ের বাসায় উঠেছেন। ঢাকায়ও এসেছিলেন একটা ব্যারিস্টারির কাজে। মুজিব ছাড়া পেয়েই লিডারের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বিরোধী রাজনীতি সংগঠনের কাজে।

শেখ মুজিবের কাছে কারাগারের ভেতরেই আজকে একটা বিচার এসেছে। বিচারপ্রার্থী বাহাউদ্দিন আহমদ। তরুণ এই কর্মীটি একটু বেশিই রাগঘেঁষা। কিন্তু তার বাবা বরিশালের উলানিয়ার বিখ্যাত জমিদার। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের আদরের সন্তান। এখন নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবাসী।

বাহাউদ্দিন বললেন, 'মুজিব ভাই, খুব একটা সমস্যা হয়েছে। মা আমার সঙ্গে "দেখা"র দিন বরফি মোরব্বা—সব তাঁর নিজ হাতে বানানো—বিদেশি বিস্কুটের কৌটা দিয়ে গিয়েছিলেন; সবই আমার মাথার কাছে রাখা ছিল। জানেনই তো আমার ঘুমটা একটু বেশি। ঘুম থেকে উঠে দেখি কৌটা, টিফিন কেরিয়ার সব খালি। এখন নাশতা করব। উঠে দেখি সামান্য কিছু রেখেছে। বেশির ভাগটাই নাই।'

মুজিব বললেন, 'এই তোমার ঘুম থেকে ওঠার আর নাশতা করার সময়। দশটা বেজে গেছে না?'

'জি, মুজিব ভাই। আপনি জানেন আমার ঘুম বেশি।'

'কে নিতে পারে?'

'সব তো ভদ্র বন্দী। ওয়ার্ড তালা মারা। বাইরের ওয়ার্ডের কেউ এসে ঢুকবে তারও উপায় নাই।'

মুজিব মাথা চুলকাচ্ছেন। এ তো প্রায় ভুতুড়ে কাণ্ড!

সবাই মাথা নিচু করে আছে। এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎই আতাউর রহমান হেসে উঠলেন।

মুজিব বললেন, 'কী রহমান, হাসো কেন?'

'অলি আহাদকে জিজ্ঞেস করেন,' বলে রহমান যতই হাসি রোখার চেষ্টা করছেন, ততই তাঁর হাসি ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

'অলি আহাদ!' মুজিব তাঁর দিকে তাকালেন।

অলি আহাদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'মুজিব ভাই। শোনেন। ছোটবেলায় আমার কালাজ্বর হয়েছিল। বহু কিছু খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু ছোট মানুষ কি বারণ শুনতে পারে! ফলে ছোটবেলা থেকেই খাবার চুরি করে খাওয়া আমার অভ্যাস। একবার টেংরা মাছ চুরি করে খেতে গিয়ে মায়ের হাতে বমাল ধরা

পড়েছিলাম।'

মুজিব বললেন, 'এই তো ভূত ধরা পড়ছে।'

'মুজিব ভাই, আমি একা নই। ওরাও সবাই আমার সঙ্গে ছিল। আর পুরাটা তো খালি করি নাই। আমার কুম্ভকর্ণ বন্ধুটির জন্যও কিছু রেখে দিয়েছি।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

অলি আহাদ বললেন, 'এই যে কারাগারের মধ্যে প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন, এ জন্য তো আপনাদের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।'

৮.

তাজউদ্দীনের ঘুম নাই, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নাই। তাঁর সঙ্গের কারই বা আছে! এই যাঁরা, মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের যুবকেরা, টাঙ্গাইলে এসে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারকাজ চালাচ্ছেন! এই আসনটা ছিল মওলানা ভাসানীর। খাজা-লিয়াকত আর নুরুল আমিনরা চান না ভাসানীকে রাজনীতিতে সক্রিয় রাখতে। তাই তাঁরা সেটাকে শূন্য ঘোষণা করেন। সরকার আর মুসলিম লীগের প্রার্থী করোটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খোরম খান পন্নী। আর মোগলটুলিকেন্দ্রিক বিরোধী রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় শামসুল হককে। শামসুল হক সাধারণ কৃষকের ছেলে। পন্নীদের প্রজা। তাঁর টাকাপয়সা বলতে কিছু নাই। এমনকি তাঁদের কোনো দলও নাই।

তার ওপর নুরুল আমিন এখন মুখ্যমন্ত্রী, টাঙ্গাইল তাঁরই এলাকা।

তাজউদ্দীনরাই এখন শামসুল হকের ভরসা। ঢাকা থেকে এসেছেন খন্দকার মোশতাক, শামসুজ্জোহা, শওকত আলী, আজিজ আহমেদ এমনি আরও অনেকে। তাঁরা উঠেছেন খোদাবক্স মোক্তারের বাড়িতে।

এর মধ্যে কামরুদ্দীন সাহেব এলেন। তিনি ৫০০ টাকা নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে জোগাড় করে। যাক, কিছু টাকা তো লাগেই। আলমাস সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরও ৮০০। শামসুল হকের ভাই নুরুল হক কয়েক মণ চাল দিয়ে গেলেন। যাক, এটা দিয়ে কর্মীদের, যারা অন্তত ঢাকা থেকে এসেছে, তাদের খাওয়াটা চলবে।

কিন্তু এ যে হাতির সঙ্গে পিঁপড়ার যুদ্ধ!

নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী, গরুর গাড়ি বোঝাই করে চাল পাঠাচ্ছেন নির্বাচনী এলাকায়।

তাজউদ্দীন বললেন, 'কামরুদ্দীন সাহেব, এইভাবে ভোটারদের কিনে ফেললে শামসুল হক সাহেব জিতবেন কী করে?'

কামরুদ্দীন বললেন, 'না, আমি পথে শুনে এলাম, লোকে বলছে, সারা দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা, লোকে খেতে পাচ্ছে না, কর্ডন করে রাখা হয়েছে জেলাগুলো, রাস্তায় মানুষ তার বিরুদ্ধে মিছিল করছে, আর এত চাল ইলেকশনের এলাকায় যাচ্ছে, ব্যাপার কী? তার মানে, সরকারের গুদামে চাল আছে। সরকার ইচ্ছা করে আমাদের না খাইয়ে মারছে।'

তাজউদ্দীন মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, এটা সরকারের জন্য হিতে বিপরীত হবে। আচ্ছা, রণদাপ্রসাদ সাহার কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি না? উনি তো আমাদেরই সমর্থন করবেন, এটা স্বাভাবিক। আপনার সঙ্গেও না ভালো সম্পর্ক?'

কামরুদ্দীন সাহেব এক হাতের আঙুল আরেক হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, 'আরেক মিনিস্টার এসে উঠেছেন আর পি সাহার বাসায়। হামিদুল হক চৌধুরী। আমার একটা সোর্স বন্ধ হয়ে গেল।'

নির্বাচনের খেলা জমে উঠল। হাতি আস্তে আস্তে কাদায় পড়তে লাগল। তাজউদ্দীন একটা লিফলেট পড়ে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পন্নীর স্ত্রী লিফলেট ছেড়েছেন। বলছেন, 'আমি তাঁর স্ত্রী, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে না থেকে তাঁর আপন বোনের সঙ্গে থাকেন।' সবাই এই লিফলেট নিয়ে কথা বলতে বেশি উৎসাহী। তাজউদ্দীন নন। তিনি মানুষকে বোঝান সরকার কীভাবে সব দিক থেকে মানুষকে শোষণ করছে, পাকিস্তান কীভাবে নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে উঠছে, জমিদাররা কীভাবে গরিবদের শোষণ করে।

হামিদুল হক চৌধুরীও বিপদে পড়লেন। *মর্নিং নিউজ*-এ খবর উঠেছে, ভারতের ডালমিয়ার যে ড্রামগুলো পাকিস্তানে আটকা পড়েছিল, সেসব ভারতে যেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য চৌধুরী ঘুষ খেয়েছেন।

এটা নিয়ে জনগণ তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

এদিকে হযরত আলী আসাম থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি দেখা করেছেন সেখানে ধুবরি কারাগারে আটক মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়ে এনেছেন টাঙ্গাইলের এই নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের উদ্দেশে লিখিত আবেদনপত্র। মওলানা বলেছেন শামসুল হককে ভোট দিন।

সেটা নিয়ে সবাই উত্তেজিত। কামরুদ্দীন সাহেব সেটা দেখে বললেন, 'এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না।'

হযরত আলী বললেন, 'কেন?'

কামরুদ্দীন বললেন, 'এতে জেলের সিকিউরিটি অফিসারের সিল নাই। এটা প্রচার করা হবে আইনের পরিপন্থী।'

'আরে, তাতে কী? এতে আইন ভঙ্গ হলে মওলানা ভাসানীর হবে, শামসুল হকের তো হবে না। আমরা এই আবেদনপত্র ছাপাব। বিলি করব। শামসুল হক জয়লাভ করবে। কারণ আকরাম খান, নুরুল আমিন আর ইউসুফ আলী চৌধুরী মিলে পন্নীর পক্ষে ভোট চেয়ে প্রচারপত্র বিলি করছে।'

'না, তা করা উচিত হবে না।' কামরুদ্দীন বললেন।

কামরুদ্দীন সাহেব আইনজীবী মানুষ। সামনে তাঁর বড় একটা মামলা পরিচালনা করতে হবে। দুই জমিদারের মধ্যে জমি নিয়ে গোলযোগে ১৯ জন খুন হয়েছে। খুব বড় মামলা। কামরুদ্দীন আহমদ টাঙ্গাইল ছাড়লেন।

শামসুল হকের একটা সাইকেল ছিল। সেটা নিয়ে তিনি প্রত্যেক ভোটারের বাড়ি যেতে লাগলেন। ভাসানীর আবেদনটাও ছাপা হয়ে বিলি হতে লাগল।

২৬ এপ্রিল, ১৯৪৯ নির্বাচন। সকাল থেকে তাজউদ্দীন ভোটের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছেন শামসুল হকের সঙ্গে সঙ্গে। তিনিও একটা সাইকেল জোগাড় করে নিয়েছেন।

ভোটাররা সব শামসুল হককে ঘিরে ধরছে। বোঝাই যাচ্ছে, জনমত শামসুল হকের দিকে।

ভোট গণনা হলো সারা রাত। সকালবেলা জানা গেল, পিঁপড়ার কাছে হাতি ধরাশায়ী হয়েছে। সামান্য প্রজার কাছে হেরে গেছেন জমিদারপ্রবর। নির্দলীয় প্রার্থীর কাছে হেরেছেন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রী আর মন্ত্রীর প্রার্থী হেরেছেন কতগুলো যুবক ছেলের দলহীন দলের কাছে।

এই উপনির্বাচনে হারার পর, ভয়ে মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে আর কোনো নির্বাচন দেয়নি।

শামসুল হক ঢাকায় ফিরবেন কিছুদিন পর। তাজউদ্দীনসমেত ঢাকায় ফিরে এলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজেকে অচেনা লাগছে। একি হাল তাঁর চেহারার! ধূলিধূসরিত সমস্ত শরীর। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামা হয়ে গেছে।

তিনি তবু হাসলেন।

এই দেশে সামন্ততন্ত্রের পতন শুরু হয়েছে।

জমিদার হেরে গেছে সাধারণ প্রজার কাছে।

ঢাকায় ফিরেও কাজের বিরাম নাই।

একটা বিরোধী দল গঠন করা হবে। রোজ গার্ডেনের বাড়িতে সমমনা রাজনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কামরুদ্দীন সাহেব সেই কাজে ব্যস্ত। তাঁর একান্ত সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ আর তাঁর সাইকেল।

৯.

মওলানা ভাসানীকে একটা কম্বল দিয়ে পেঁচানো হয়েছে। ৬৫-৭০ বছর বয়স এখন তাঁর। আষাঢ়ের গরমে তিনি সেদ্ধ হচ্ছেন। তাঁকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে বসানো হয়েছে। পাশে বসেছেন শওকত আলী। ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে মোগলটুলির থেকে। রোজ গার্ডেন নামের বাড়ির দিকে। বাড়িটা স্বামীবাগে। বাড়ির মালিক কাজী মোহাম্মদ বশির হুমায়ুন। রোজ গার্ডেন নামের বাড়িটা যেন সত্যি গোলাপের বাগান। দোতলায় হলঘর। সেখানে ঠাঁই নিতে পারে শ চারেক মানুষ।

ঢাকায় সিমেন্টের তৈরি পাকা বাড়ি কম। বাড়িঘর বেশির ভাগ কাদাসুরকি দিয়ে গড়া, এগুলোকে বলা হয় গঙ্গা-যমুনা গাঁথুনি। ছাত্রদের ইকবাল হল মুরলি বাঁশের তৈরি। সে তুলনায় রোজ গার্ডেন সত্যিই একটা ব্যতিক্রমী বাড়ি।

হলঘর গমগম করছে

মওলানা ভাসানীকে ওই বাড়িতে রাখা হলো। তাঁর বাইরে বেরোনো নিষেধ। কারণ পুলিশের ভয়।

মওলানা সম্প্রতি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন আসামের ধুবরি থেকে। তিনি ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের কাছে তিনি অবাঞ্ছিত। এক বছর আগে আইনসভার বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা করার সময়ে মওলানা আইনসভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা না করে বাংলায় করার আহ্বান জানান। বলেন, 'জনাব সদর সাহেব, এখানে যারা সদস্য আছেন, তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন যে এটা বাংলা ভাষাভাষীদের দেশ. এই অ্যাসেম্বলির যিনি সদর তিনিও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলবেন। আপনি কী বলেন, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না... আশা করি, আপনি বাংলায় রুলিং দেবেন।' এরপর তিনি সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করতে শুরু করেন। এ কারণেই সরকার তাঁর সদস্যপদ বাতিলের অজুহাত খুঁজতে থাকে। তিনি নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেননি, এই অজুহাতটা পাওয়া যায়। অবশ্য ওই হিসাব কেউই জমা দেয়নি, তাতে কি, এখন মওলানা ভাসানীর সদস্যপদ নিয়ে কথা হচ্ছে, আগে তাঁরটা বাতিল করা হোক।

তো, মওলানা ভাসানীকে পাওয়া গেছে ঢাকায়। মধ্যখানে আসামে গিয়ে তিনি কিছুদিন জেল খেটে এসেছেন। ওদিকে সোহরাওয়ার্দীও কিছুদিন আগে ঢাকা এসেছিলেন মামলা পরিচালনার কাজে। তিনি পরামর্শ দেন, ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম দিয়ে একটা বিরোধী সংগঠন খোলা হোক। মওলানা ভাসানীকে করা যেতে পারে তার সভাপতি। শামসুল হকের কাছে পন্নীর পরাজয়ে সবাই খুবই উৎসাহিতও আছে। মোগলটুলির কর্মীরা তাই উৎসাহভরে কাজ করছে একটা নতুন দল গঠনের জন্য।

মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ, যারা আবুল হাশিম আর সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক, তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। হলঘর গমগম করছে ২৫০-৩০০ লোকের উপস্থিতিতে।

তাজউদ্দীন আহমদ এতে উপস্থিত আছেন। হাজির হয়েছেন অলি আহাদও।

আতাউর রহমান খান এসেছেন। ফজলুল হক খানিকক্ষণ থেকে বক্তৃতা দিয়েই চলে যান। শামসুল হকের নেতৃত্বে মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সবাই এতে যোগ দেন।

সভায় ৪০ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। সহসম্পাদক খন্দকার মোশতাক আহমদ। সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতারা একযোগে শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করায় তাঁকে একমতে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়।

খন্দকার মোশতাক একটু মন খারাপ করলেন। তাঁকে মুজিবের পরে রাখা হলো কেন? মওলানা ভাসানীকে কাল রাতে কম্বল পেঁচানোর সময় তিনি কি তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরেননি? শামসুল হকের সঙ্গে টাঙ্গাইল গিয়ে তাঁর পক্ষে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করেননি? শেখ মুজিবের চেয়ে তিনি কি বয়সে এক বছরের বড় নন?

শেখ মুজিব কারাগারে বসে জানতে পারেন, তিনি এই নবগঠিত দলের যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন। সম্পাদক হয়েছেন শামসুল হক।

শেখ মুজিব নিজের পদমর্যাদা নিয়ে চিন্তিত হলেন না, বরং তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলো, সেটি নিয়েই তিনি বেশি ভাবিত। এখন তিনি একটা দল পেয়ে গেছেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দল আর মানুষকে সংগঠিত করার কাজে।

পরের দিন, ২৪ জুন, ১৯৪৯। আরমানিটোলা ময়দানে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা। প্রথম জনগণের সামনে আসা।

বিকেলবেলা। একটু পরে জনসভা শুরু হবে। হাজার চারেক লোক এরই মধ্যে উপস্থিত। হঠাৎই হামলা করে বসে মুসলিম লীগের গুন্ডারা। তারা মঞ্চ ভেঙে ফেলে, চেয়ারটেবিল তছনছ করে।

মঞ্চ দখল করে মঞ্চের ওপর সবচেয়ে বেশি যে লাফায় তার নাম শাহ আজিজ। এখন মুসলিম লীগের নেতা।

শেখ মুজিব কারাগারে, তা না হলে শাহ আজিজকে তিনি মনে করিয়ে দিতে পারতেন কুষ্টিয়া সম্মেলনের মুষ্টাঘাতটার কথা।

ওই টর্নেডো চলে গেলে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা আবার মঞ্চে ওঠেন। মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে লীগ সরকারের ২২ মাসের অপকীর্তি তুলে ধরেন।

১৩.

আজ মুজিবকে কারাগারে নেওয়া হবে। তোলা হলো প্রিজনার্স ভ্যানে। শেভ করে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে মুজিব ধীরে-সুস্থে উঠলেন ভ্যানে।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। গরমও পড়েছে। ভ্যান থেকে নেমে মুজিব ইচ্ছা করেই খানিকটা দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির পানি তাঁর চুল,

পাঞ্জাবি ভিজিয়ে দিচ্ছে। তিনি তা-ই চান। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই বৃষ্টির পানির স্পর্শটুকু তাঁর খুব ভালো লাগে।

আদালতে ভিড় করলেন কর্মীরা। বিশেষ করে ছাত্ররা। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-কর্মচারীরাও। তাঁদের মধ্যে থেকে তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে গিয়ে মুজিব গেপ্তার হয়েছেন। আর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। মুজির ভাইকে আজকে কোর্টে তোলা হবে শুনে তাঁরা তাই এসেছেন দল বেঁধে।

মুজিব প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এনামুল কেমন আছো? আসগর আলী, শফিকুর রহমান?

বারান্দায় ভিড় জমে যায়। সেই ভিড়ের মধ্যেই হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে একজন শার্ট পরা সৌম্যদর্শন মানুষের ওপর। আরে, মানিক ভাই এখানে! 'মানিক ভাই! এই ছাত্র ভাইরা, একটু সরো। আমার ভাইকে একটু কাছে আসতে দাও?'

ভিড় সরে যায়। তফাজ্জল হোসেন মানিক এগিয়ে আসেন।

বরিশালের ভাণ্ডারিয়ার ছেলে মানিক ভাই। পিরোজপুর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বিএ। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ তো মুখ নয়, যেন বন্দুকের নল। সরকারের বিরুদ্ধেই তা থেকে নানা ধরনের গোলা বের হতো। কাজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চললেন কলকাতা।

তাঁর সঙ্গে মুজিবের পরিচয় আজ থেকে বছর ছয়েক আগে, সেই কলকাতায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাসায়। দুজনই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভক্ত। ভক্ত থেকে তাঁরা হয়ে গেলেন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য। একই নেতার দুই শিষ্য, যেন এক পিতার দুই সন্তান। মানিক ভাইকে মুজিবের মনে হয় নিজের বড় ভাইয়ের মতো। তাঁর চেয়ে বছর নয়-দশেকের বড়ই হবেন মানিক মিয়া।

মানিক মিয়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাগজ *ইত্তেহাদ*-এ কাজ করতেন। ব্যবস্থাপনার কাজ।

সাতচল্লিশের পরপর যে তিনি কলকাতা ছেড়েছেন, তা নয়। *ইত্তেহাদ* কলকাতা থেকে বের করা হচ্ছিল। সেখান থেকেই ঢাকা আসত। শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন তা ঢাকায় বিলিও করেছেন। কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব বাংলায় *ইত্তেহাদ* প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ফলে পত্রিকাটার প্রচারসংখ্যা গেল কমে, আর্থিকভাবে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

মানিক মিয়া সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন। মুজিব, মানিক—দুই ভাই আবার এক শহরে।

মানিক দেখলেন, মুজিবের মাথায় বিন্দু বিন্দু জল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে জল মুছে দিলেন। তারপর আরেক পকেট হাতড়ে বের করলেন একটা কাগজ। 'দেখো।'

'কী এটা?'

'আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি। করাচিতে পোস্টিং। আপনি কী বলেন, যাব?'

'আপনি না এখানে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করার চেষ্টা করছেন?'

'করছি তো। কিন্তু সাধ্যে তো কুলাচ্ছে না। চারদিকে বিরূপ পরিবেশ। সোহরাওয়ার্দীর লোক আমরা। এখানে কেউ বাসাটা পর্যন্ত আমাদের ভাড়া দিতে চায় না।'

'তা তো আমি জানি। কিন্তু মানিক ভাই, আমাদের তো একটা মিশন আছে। গণতন্ত্র, গভর্নমেন্ট বাই দি পিপল ফর দি পিপল অব দি পিপল। আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে চলে গেলে আমাদের সেই মিশনের কী হবে?'

'যাব না বলছেন?'

'লিডারের আদর্শের পক্ষে এত দিন কাজ করলেন, আর আজ যাবেন খাজার চাকরি করতে করাচি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। ছেলেপুলে নিয়ে পানের দোকানদারি করে খাব। সেও ভালো। তবু ওদের চাকরি নয়।'

আদালত বসছে। মুজিব এজলাসের দিকে এগোলেন। অধৈর্য পুলিশ তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

'মানিক ভাই, আপনার ছোট ভাই মুজিব বেঁচে থাকলে আপনার স্বপ্ন সাপ্তাহিক কাগজ অবশ্যই বের হবে। ইয়ার মোহাম্মদ আমার দোস্ত। আপনি তাঁর কাছে যান। আমার কথা বলেন।' বলতে বলতে মুজিব এজলাসের ভেতর ঢুকে গেলেন।

১১.

আওয়ামী মুসলিম লীগের কাজ চলছে সারা প্রদেশজুড়ে। মওলানা ভাসানী ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেলা থেকে জেলায়। শামসুল হক তৎপর। কিন্তু কাগজে তাঁদের কথা প্রকাশ হয় না। *আজাদ* ঢাকায় এসেছে, এটা তো খাজাসমর্থক কাগজ। *অবজারভার*ও তাই।

একমাত্র উপায় হলো নিজেদের কাগজ বের করা। মানিক মিয়ার সাধ আছে সাধ্য নাই।

মানিক মিয়া গেলেন ইয়ার মোহাম্মদের কাছে। ইয়ার মোহাম্মদের বাবা ছিলেন ঢাকার বড়লোকদের একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে বিমানবন্দর নির্মাণের ঠিকাদারি করে তিনি বিশাল ধনী হয়েছিলেন। ইয়ার মোহাম্মদ যখন স্কুলে পড়েন, তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ইয়ার মোহাম্মদ অগাধ সম্পত্তির মালিক হন। তখন থেকেই তিনি রাজনীতিসচেতন ছিলেন, সমর্থন করতেন মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপটাকে।

এরই মধ্যে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

মওলানা ভাসানী আর তাঁর আওয়ামী মুসলিম লীগকে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে তুলেছেন। তাঁর কারকুন লেনের বাড়িতেই মওলানা ভাসানী থাকেন। এটাই আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস। ইয়ার মোহাম্মদের স্ত্রী বয়স্ক মওলানার সেবাযত্ন করতেন। সারাক্ষণ পার্টির নেতা-কর্মীতে বাড়ি গমগম করত। পারিবারিক গোপনীয়তা বলতে তাঁদের আর কিছুই রইল না। ইয়ার মোহাম্মদের স্ত্রী-সন্তানদের সমাজের নানা কথা শুনতে হতো, বৈরী সরকারের জুলুমের ভয় তো ছিলই।

ইয়ার মোহাম্মদকে মানিক মিয়া জানালেন তাঁর ইচ্ছার কথা। 'সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে চাই। শেখ মুজিব আপনার কাছে আমাকে আসতে বলেছেন।'

আচ্ছ, এসেছেন যখন, মুজিব ভাই যখন বলেছেন, হবে।

এদিকে সরকারি কাগজগুলোয় শুধু সরকারের পক্ষের খবর ছাপে; বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগের খবর ছাপে না। মওলানা ভাসানী যারপরনাই বিরক্ত। মওলানা ভাসানী উদ্যোগী হলেন।

ঢাকা বার লাইব্রেরিতে গেছেন তিনি। আইনজীবীরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন। মওলানা বললেন, 'আমি একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা আমাকে সাহায্য করেন।'

আইনজীবীরা সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলেন। ৪০০ টাকা চাঁদা উঠে গেল তখনই।

মুজিব মুক্তি পেলেন কারাগার থেকে।

একটার পর একটা মিছিল করছেন। সমাবেশ করছেন। শেখ মুজিব চাঁদা তুললেন কিছু।

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠাতা, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রকাশক আর মুদ্রাকর, *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* বের হতে লাগল। প্রথম দিকে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*কে। শুধু ডিক্লারেশন বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাসে দুই পাতা বের করা হতো।

তখন এগিয়ে এলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি মওলানা ভাসানীকে বললেন, '*ইত্তেহাদ*-এ আমি ছিলাম সুপারিনটেন্ডেন্ট। কাগজ কী করে বের করতে হয়, এটা আমি জানি। আমি পারব। দায়িত্বটা আমার ওপর ছাড়েন।'

মানিক মিয়ার ওপর দায়িত্ব দেওয়ার পরে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* সজীব হয়ে উঠল।

আওয়ামী মুসলিম লীগ তার খবর প্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজে পেল। বাংলার মানুষও পড়ার মতো একটা কাগজ পেয়ে গেল। পত্রিকাটা জনপ্রিয়তা পেতে লাগল দ্রুতই। তাতেই টনক নড়ে গেল সরকারের। তারা ছাপাখানার মালিকদের ভয়ভীতি দেখাতে লাগল কেউ যেন ওই কাগজ না ছাপে। মালিকেরা সরকারের ভয়ে *ইত্তেফাক* ছাপতে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল।

একটার পর একটা ছাপাখানা বদল করতে হলো পত্রিকাটিকে।

১২.

শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকারের পুলিশ, পুলিশের গোয়েন্দাদের চলছে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। মুক্তি পেয়েও মুজিবের শান্তি নাই। তিনি গোপালগঞ্জ যান। আবদুস সালামও তাঁর সঙ্গে আছেন। জনসভা

করবেন। চোঙামাইকে প্রচার চলেছে। এরই মধ্যে থানায় থানায় ইউনিয়নে ইউনিয়নে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হচ্ছে। চারদিকে ব্যাপক সাড়া। স্টিমার থেকে গোপালগঞ্জ ঘাটে মুজিব যখন নামছেন, তখনই ঘাটে ভিড়।

সরকার ভয় পেয়ে গেল। প্রশাসন আর মুসলিম লীগ নেতাদের টনক গেল নড়ে। কী করা যায়? তারা ১৪৪ ধারা জারি করল। অর্থাৎ সভা করা যাবে না।

শেখ মুজিব ওই বান্দা নন যে প্রশাসন তাঁকে বাধা দিল, আর গ্রেপ্তারের ভয়ে তিনি তাঁর আহূত জনসভা থেকে বিরত থাকবেন।

তিনি কোর্ট মসজিদে মিলাদের কর্মসূচি দিলেন। সবাই হাজির হলো মসজিদ প্রাঙ্গণে। শেখ মুজিব মিনারে উঠে বক্তৃতা শুরু করলেন। এই এলাকাটাও ১৪৪ ধারার অধীনে আছে, মসজিদের ভেতর মিলাদ পড়া যাবে, কিন্তু বাইরে সভা করা যাবে না।

মুজিব বললেন, 'আমি গ্রেপ্তার বরণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। তবু আমার কণ্ঠস্বর কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না।'

হাজার হাজার মানুষ চিৎকার করে উঠল, 'শেখ মুজিবের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগে মামলা করে দিল।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সেসব তথ্য প্রতিবেদন আকারে পাঠাল তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে।

রাতের বেলা মুজিব হাজির হলেন তাঁদের গোপালগঞ্জের বাসায়।

বাবা বললেন, 'খোকা, বাড়ি যাবা না? বউমার তো যখন-তখন অবস্থা?'

মুজিব বললেন, 'যাব, কাল সকালেই রওনা দেব। পুলিশ আমার বিরুদ্ধে মামলা জারি করেছে। ১৮৮ ধারা।'

গোপালগঞ্জ থেকে নৌপথে রওনা হলেন মুজিব, টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে।

হাসুর বয়স সামনের মাসে দুই বছর পুরো হবে। সে এখন অনেক কথা বলে। প্রথম প্রথম আব্বার কোলে উঠতে চাইত না। কিন্তু তারপর ঠিকই উঠল। বাপের ঘাড়ে মাথা গুঁজে দিল। মুজিব তাঁকে নিয়ে চললেন খালের পাড়ে।

খালটা ছোট, কিন্তু খাড়া। ভেতরে বড় বড় নৌকা। জোয়ারভাটা হয় নিয়মিত। তিনি বাচ্চা কোলে হাঁটেন, তাঁর এলাকার বন্ধুবান্ধব সব হাজির হন তাঁর কাছে। তরুণ-কিশোরেরাও আসে। মিয়া ভাই এসেছেন, তারা তাঁকে দেখতে চায়। এর মধ্যে মিয়া ভাইকে যে পুলিশ আটক করেছিল, তিনি যে আবারও কারাগার থেকে ঘুরে এসেছেন, এলাকার মানুষ জানে।

তাঁরা তাঁকে কত প্রশ্ন করেন!

'মিয়া ভাই, চাউলের দাম যে খালি বাড়তিছে, এই আজাদির কী মানে হইল?'

'মিয়া ভাই, সুরাবার্দী সাবরে মিনিস্টার বানাবি না?'

'খোকা, মাওলানা ভাসানি কেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হইল? সরওয়ার্দী সাব নাইলে একে ফজলুল হক তো হইতি পারত?'

বিকেল বেলা আকাশে মেঘ। বৃষ্টি হবে নাকি আবার! মেয়েকে কাঁধে নিয়ে মুজিব চললেন বাড়ির দিকে। পেছনে পেছনে চললেন দর্শনার্থীরাও।

মুজিব বললেন, 'রেনু, চিঁড়ামুড়ি কী আছে, দাও দিকিনি। এরা কি খালি মুখে যাবে?'

রেনু বললেন, 'আমি উঠছি। আমি দেখতিছি।'

তিনি বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর পেটটা এবার বেশ উঁচু।

মুজিব বললেন, 'না না, তুমি উঠো না। তুমি বসে থাকো। আমি দেখতেছি। ওরাও দেখবে নে।'

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি এল। রেনু ঘরে গিয়ে বসলেন। অসময়ে এই শরীরে বৃষ্টির ছাট লাগানো ঠিক হবে না। মুজিব হাসুকে দিয়ে দিলেন তার মায়ের কোলে।

হাসু দাদির কোলে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল।

'দাদি' 'দাদি' বলে কী যে একটা হাসি হাসল বাচ্চাটা!

মুজিব বারান্দায়। কিন্তু তাঁকে দেখতে আসা ছেলেপুলের দল উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যে বৃষ্টিতে ভিজছে তাতে তাদের কোনোই আপত্তি নেই।

মুজিব ভাবলেন, এই লোকগুলো নিচে উঠোনে ভিজবে, আর তিনি বারান্দার উঁচুতে টিনের চালের নিচে মাথা বাঁচিয়ে রাখবেন, তা হয় না।

তিনি নিজেই নেমে গেলেন উঠোনে। শ্রাবণের ধারা তাঁকেও ভিজিয়ে দিতে লাগল।

ছেলেপুলের দল হইহই করে উঠল মিয়া ভাইকে তাদের মধ্যে পেয়ে।

হইহই করতে করতে তারা বাড়ির খুলিতে গেল।

বাড়ির সামনে জামরুলগাছ। এই জামরুলগাছের জামরুল কত খেয়েছেন ছোটবেলায়! সব গাছে উঠতে পারতেন। এমনকি নারকেলগাছেও। এই যে দিঘি, এই দিঘিতে কত সাঁতার কেটেছেন! নদীপারের ছেলে, কখন যে সাঁতার শিখে গেছেন আপনা-আপনি, কে আর আলাদা করে খেয়াল রাখে।

রাতের বেলা ভাত খেতে বসেছেন মুজিব। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন রেনু। মা ভাত তুলে দিতে লাগলেন।

মা বললেন, 'খোকা, বউমার তো মনে হয় এবার পোলা হবি। পেটটা তো বেশি উঁচা দেখা যায়।'

মুজিব হাসলেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখের হাসিটা কী যে অপূর্ব লাগছে! মা তাঁর দিকে তাকিয়ে 'মাশাল্লাহ' বলে উঠলেন, যেন নজর না লাগে।

মুজিব কাঁসার গেলাস তুলে পানি খেলেন।

মা বললেন, 'খাওয়ার সময় পানি খায় না, বাবা।'

তারপর বললেন, 'জেলখানায় কী খাতি দেয়, বাবা?'

মুজিব বললেন, 'আমাদের তো ভালো ভালো খাবার দেয়, মা। আমরা তো সিকিউরিটি। ডাক্তার দেখে যায়, ওজন কমলে স্পেশাল ডায়েট দেয়। তখন বাড়তি ডিম-দুধ। আমরা সব খেয়ে শেষ করতে পারি না। অন্য ওয়ার্ডে পাঠায়া দেই।'

মা বললেন, 'খোকা, পিঠা পাঠিয়েছিলাম, পাইছিলি?'

'জি মা, তোমার পিঠার তো সবাই খুব প্রশংসা করল। এত ভালো পিঠা নাকি কেউ খায়নি কোনোদিন। আমি বললাম, আমার মায়ের হাতের পিঠা, সবার চেয়ে মিঠা।'

রাতের বেলা রেনু বললেন, 'মাকে কেন বলতি গেলা সবাইরে তুমি পিঠা দিয়েছ? মা তো আশা করে আছেন সবটাই তুমি খেয়েছ!'

মুজিব হাসলেন, 'তুমি কী করে বুঝলা?'

'তুমি যখনই বললা সবাই খুব প্রশংসা করেছে, মার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে আঁধার করে এল, তাতেই বুঝলাম।'

হাসু নড়ে উঠল। রেনু তার গায়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

তারপর বললেন, 'আমার কিন্তু ডেলিভারির সময় হয়ে এসেছে। তুমি থেকে যাবা তো কত দিন! বাচ্চা দেখে যাবা না?'

মুজিব বললেন, 'রেনু, আমার যে অনেক কাজ। মানিক ভাই পত্রিকা বের করবেন। তাঁর পাশে আমার থাকতে হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মুসলিম লীগ সরকার অনেক অন্যায়-অত্যাচার করতেছে, সেসবের একটা বিধান করতে হবে। আর তা ছাড়া এক জায়গায় থাকলে পুলিশই এসে ধরে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে যাওয়া ভালো। আমি একটু করাচি যেতে চাই। লিডারের সঙ্গে পরামর্শ আছে।'

রেনু দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন, 'তোমাকে আমি আটকাব না। তুমি যাও। খালি নিজের যত্ন নিও।'

দুজনই জেগে রইলেন অতঃপর। চুপচাপ।

রেনু বললেন, 'সবাই বলছে ছেলে হবি। তুমি ছেলে চাও, না মেয়ে চাও?'

মুজিব বললেন, 'আল্লাহ যেটা দেন। আমি স্বামী হিসেবেও ভালো না। বাবা হিসেবেও না। আমার কি ছেলে না মেয়ে বেছে নেওয়ার কথা বলা সাজে? আর তা ছাড়া আল্লাহ যা দেন আমি তাতেই আল্লাহর কাছে হাজার শোকর করব। শুধু চাই তুমি সুস্থ থাকো। বাচ্চা সুস্থ থাকুক।'

রেনু বললেন, 'ছেলে হলে কী নাম রাখবেন?'

মুজিব বললেন, 'জেলে বসে আমি এই কথাটা অনেক ভেবেছি। তুর্কি বীর কামাল পাশার নামে নাম রাখব। তুমি কী বলো! ছেলে হলে নাম রাখব "শেখ কামাল"।'

রেনু বললেন, 'সুন্দর নাম।' তিনি উঠে বসে পান সাজাতে লাগলেন।

শেখ মুজিব বিদায় নিলেন পরের দিনই। তার সাত দিন পর

রেনু একটা ছেলের জন্ম দিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান।

শ্রাবণের সেই দিনটায় খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ ভেদ করে 'শেখ কামাল' নামের সদ্যোজাত শিশুটা তার জন্ম ঘোষণা করল। দাদা শেখ লুৎফর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আজান দিতে লাগলেন: আল্লাহু আকবর।

বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে তাঁর আজানের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ঢাকায় গিয়ে তিনি উঠলেন ৯ পাতলা খান রোডে। তাঁর নেতাকে চিঠি লিখলেন।

জনাব,

আপনার প্রতি আমার সালাম। আপনি সব খবর পাবেন মানিক ভাইয়ের চিঠিতে। আপনাকে দেখার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি। আর আপনার সঙ্গে আওয়ামী লীগ আর পার্লামেন্টের ব্যাপারে আমার জরুরি কিছু কথা আছে। দয়া করে আমাকে লিখবেন, সব ধরনের দিকনির্দেশনা দেবেন। আপনি কেমন আছেন?

আপনার স্নেহের মুজিবুর

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাকে এক মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যাপারে আপনার দেওয়া নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের হাতে কোনো তহবিল নাই। যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। খোদা হাফিজ।

মুজিবুর

ইংরেজিতে লেখা এই চিঠিটা তিনি মি. এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর নামে ১৩এ কাচারি রোড, করাচির ঠিকানায় পৌছানোর আশায় খামে ভরে ডাকে দিয়ে দিলেন।

মুজিব জানলেনও না যে তাঁর এই চিঠি গোয়েন্দা পুলিশ আটক করল। এই চিঠি তার প্রাপকের হাতে আর কোনো দিনও পৌছাবে না।

সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লিডারের কাছ থেকে কোনো বার্তা আসছে না। মানিক ভাইয়ের চিঠিতে বিস্তারিত জানানো হয়েছে ঢাকার পরিস্থিতি। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*-এর জন্যও তহবিল দরকার।

চিঠি পাঠানোর ১৫ দিনের মাথাতেও কোনো উত্তর না পেয়ে মুজিব আবার চিঠি লিখতে বসলেন তাঁর নেতাকে।

ইংরেজিতে তিনি লিখলেন:

১৫০, মোগলটুলি, ঢাকা
২১/৮/৪৯

জনাব,

আশা করি মানিক ভাইয়ের চিঠির সঙ্গে পাঠানো আমার চিঠিটা পেয়েছেন। আমরা সবাই ওই চিঠিতে আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আপনার উত্তরের অপেক্ষায় উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। আপনি নিশ্চয়ই বর্তমান শাসকদের হীন মনোভাব উপলব্ধি করছেন। দমন-নিপীড়নের হেন উপায় নাই তারা অবলম্বন করছে না। কথায় কথায় ১৪৪ ধারা জারি, আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার, হয়রানি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব সত্ত্বেও আমাদের সাংগঠনিক কাজ চলেছে অপ্রত্যাশিত রকম দ্রুতগতিতে। কিন্তু একটা সংগঠন হিসেবে আমাদের সব কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হতে পারে না। আগের দিন আমরা আরমানিটোলা ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটা জনসভার আয়োজন করেছিলাম। সরকারি দল আমাদের জনসভা ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য হেন ধরনের হীন কৌশল আছে অবলম্বন করেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের হীন কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের জনসভাটি খুবই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সভায় ৫০ হাজারের মতো মানুষ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে কোনো প্রচার নাই। এই কারণে আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া আপনি অন্যান্য অসুবিধাগুলোর কথাও জানেন। মফস্বলে আমাদের কর্মীদের যারপরনাই হেনস্থা করা হচ্ছে। আজ রাতেই আমি গোপালগঞ্জ আর বরিশাল রওনা হয়ে যাব। আমাদের কর্মীদের ওখানে

আমার ভাইকে একটু কাছে আসতে দাও

নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের শিকার হতে হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনের তারিখ ঠিক হয়েছে ১৬, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। আপনি কি দয়া করে একটু দেখবেন মিয়া মোনজোরাল আলম, আবদুস সাত্তার খান, নিয়াজি (প্রাক্তন এমএলএ, পাঞ্জাব) আর পশ্চিম পাঞ্জাবের গোলাম নবীকে সম্মেলনে পাওয়া যাবে কি না? আপনার কাছ থেকে শোনার পরেই আমরা তাঁদের আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে পারব।

আপনি কবে ঢাকা আসবেন? আমরা সবাই উদ্বেগের সঙ্গে আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অপেক্ষা করছি।

মানিক ভাই খুব অস্থির অবস্থায় আছেন। তা সত্ত্বেও আমর তাঁকে অনুরোধ করেছি আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অফিসটার দায়িত্ব নিতে।

শ্রদ্ধাসহ

আপনর স্নেহের

মুজিবুর রহমান।

আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা আমরা করেছিলাম। এমনকি তিন দিন আগে আমরা গভীর রাতে বসে থেকে আপনাকে ফোন করি। করাচি এক্সচেঞ্জ জানায়, আপনি রাত দুটোতেও বাসায় নাই।

ম. র

শেখ মুজিব চিঠি লিখছেন তাঁর লিডারকে। সেটা গোয়েন্দারা আটকে ফেলছে। শেখ মুজিব ফোন করছেন। করাচি এক্সচেঞ্জ বলছে সোহরাওয়ার্দী বাসায় নাই। রাত দুটোতেও সোহরাওয়ার্দী বাসায় থাকেন না!

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাব ইন্সপেক্টর এই চিঠিটা ২৬ তারিখে তাদের যথাযথ ফাইলে জমা দেয়।

১৩.

ছোট্ট একটা পুতুল পেয়েছে হাসু। মায়ের কোল ঘেঁষে সারাক্ষণ থাকে তার ছোট ভাইটি। হাসু তার দুই বছরের জবানে আধো আধো বোল ফুটিয়ে বলে, 'কোলে দেও। আমার কোলে দেও।'

রেনু হাসুকে জলচৌকির ওপরে বসান। তারপর তার কোলে ২৫ দিন বয়সী কামালকে তুলে দেন। হাসু দিব্যি তাকে কোলে নেয়। মা দুজনকেই ধরে রাখেন। উঠোনে মুরগি চরছে। বরইগাছে কাঁচা বরইয়ে ঢিল দিচ্ছে পাড়ার ছেলের দল। বিকেলের আলো পড়েছে উঠোনে। ছোট্ট বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামাতেই চায় না হাসু। রেনু তবু তার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিজের কোলে তুলে নেন।

'যাও তো দেখো দাদি কী করতিছে?' রেনু বলেন।

'হাসু, এদিকে আয়,' দাদি হাঁক পাড়েন।

হাসু থপথপ করে ছোট্ট পা ফেলে দাদির দিকে যায়। একটা মুরগি অনেকগুলো ছানা দিয়েছে। উঠোনে তারা চরছে। হাসু দেখে, কী সুন্দর হলুদ রঙের একেকটা মুরগির বাচ্চা! সে সেদিকে হাত বাড়াতে চায়। মা-মুরগি তেড়ে আসে কক কক শব্দ করে। রেনুর বুকটা কেঁপে ওঠে। এই বুঝি হাসুকে ঠোকর মারে। তিনি **মুখে শব্দ করে ওঠেন।**

কোলের বাচ্চা কাঁদে। তাকে আবার আঁচলের নিচে নেন।

বাচ্চাদের আব্বার দেখা নাই। তিনি গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন। বরিশাল **যাচ্ছেন। একবারও আসতে পারেন** না টুঙ্গিপাড়ায়।

ছেলেটার মুখটাও কি তিনি একটু দেখবেন না?

এর মধ্যে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। তাঁকে খুঁজে গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার অন্ত নাই। গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

আবার যেকোনো দিন গ্রেপ্তার হবেন। জেলে যাবেন। রেনুর বুকটা কেঁপে ওঠে। হাসু আবার এসেছে তাঁর কাছে, 'মা, **কোলে** নেও।'

মা-মুরগিটার মতোই পক্ষ বিস্তার করে রেনু তাঁর আঁচলের নিচে **হাসু-কামাল দুজনকেই** টেনে নেন।

এই সময় ঘাটে নৌকা এসে ভেড়ে। **বরিশাল থেকে ফেরার** পথে মুজিব টুঙ্গিপাড়ায় নেমেছেন।

পাড়ায় হইহই শোনা যায়।

মিয়াভাই আইছে। মিয়াভাই আইছে।

রেনুর বুকটা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। সত্যি কি সে এসেছে?

'কই, আমার পোলা কই?' মুজিবের ভরাট গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

মুজিবের মা ছুটে যান বাইরে। 'খোকা, এসেছ **বাবা! আসো।** ওই **যে তোমার** পোলা।'

রেনুর **মুখের দিকে তাকান মুজিব। শেষ** বিকেলের **সোনালি** রোদ পড়েছে রেনুর মুখে। রেনুকে একটা পিতলের মূর্তির মতো দেখা যাচ্ছে। সেই মুখে ফুটে উঠেছে অপূর্ব হাসি।

মুজিব এসেই বলেন, 'দেও, পোলারে কোলে দেও।'

রেনু বলেন, 'তুমি জার্নি করে এসেছ। যাও, আগে হাতমুখ ধুয়ে নেও। কাপড় পাল্টাও। এত ছোট বাচ্চা, আ-ধোয়া হাতে ধরতে নাই।'

রেনু মুজিবের কোলের কাছে বাচ্চাটাকে ধরেন। মুজিব ছেলের কপালে চুম্বন করেন। হাসু গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লে তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, 'হাসু মাকে কোলে নিতে নিশ্চয়ই মানা নাই। আমি আসতেছি হাতমুখ ধুয়ে।'

'কিন্তু কাপড় আর বদলাব না। আজ রাতেই আমি ঢাকা চলে যাব। **অনেক কাজ। দেশে দুর্ভিক্ষ। লোকে না খেয়ে আছে। এর** মধ্যে **লিয়াকত** আলী **খান আসতেছে ঢাকায়।' মুজিব একমনে** বলতে **বলতে চললেন বারান্দার** দিকে। **এরই** মধ্যে **বালতি-বদনায়** পানি এসে গেছে।

রেনুর মুখের হাসিটা নিভে আসে। মুজিব আজই চলে যাবে? তাহলে আসার দরকারই বা কী ছিল?

মুজিব সেটা লক্ষ করেন। হাত-পা ধুতে আরম্ভ করলে রেনু তাঁর পাশে গামছা নিয়ে দাঁড়ান।

তিনি গামছা দিয়ে হাতমুখ মুছে গামছাটা তারে ঝুলিয়ে কামালকে কোলে নেন।

রেনু বলেন, 'বলো তো ও দেখতে কার মতো হয়েছে?'

মুজিব দেখেন, হুবহু একটা ছোটবেলার মুজিব তাঁর কোলে। কিন্তু রেনুকে খুশি করার জন্য তিনি বলেন, 'না, ধরতে পারতেছি না। তোমার চোখই তো পেয়েছে মনে হচ্ছে।'

রেনু হাসেন। বলেন, 'ওর দাদি বলে ছোটবেলায় খোকা একদম এই রকমই ছিল দেখতে।'

মুজিব বলেন, 'আজকা রাতে আর তাহলে যাই না। কাল যাব। ভোরবেলা উঠেই যাওয়া লাগবে। লিডারের কোনো খবর পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমাকে করাচি যাওয়া লাগবে।'

মুরগি ধরা হচ্ছে। বাড়ির রাখাল-মাঝি সব উঠান ঘিরে ধরেছে। তারা একটা লাল মোরগ টার্গেট করেছে। ওটার ওপর এখন ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। হায়দার আলী তার খ্যাপ মারা জালটা নিয়ে এক কনুইতে মেলে ধরে দুহাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। মোরগের ওপরে জাল নিক্ষেপ করা হবে।

জাল ছোড়া হলো বটে, কিন্তু লাল মোরগটা উড়ে গিয়ে উঠে গেল ঘরের চালে। তাই দেখে হাসু হাততালি দিয়ে ওঠে।

ভোরবেলাতেই নৌকায় ওঠেন মুজিব। গৃহকর্ম তাঁর কাজ নয়। রেনুও হাসিমুখেই তাঁকে বিদায় দেন ঘাটে এসে। হাসু আর কামালকে চুমু দিয়ে মুজিব উঠে পড়েন নৌকায়।

নৌকা চলতে শুরু করে। বাইগার খাল থেকে কাটা গাঙ; তারপর মধুমতী। ভোর হচ্ছে। শরতের ভোর। পুব আকাশ ফরসা করে সূর্য উঠছে। এক ঝাঁক বক এসে বসছে নদীর ধারে। নদীর ধারে ধানক্ষেত। আমনধানে শিষ আসছে। মাছরাঙা রঙিন পাখা মেলে পুরো প্রভাতটাকেই রঙিন করে তুলেছে।

মুজিব বাংলা মায়ের এই রূপ দেখে মুগ্ধ হন—আপন মনেই বিড়বিড় করতে থাকেন:

'চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে,
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে।'

কবিতাটার কথা মনে করে মুজিব আশ্চর্য হলেন। এই কবিতায় রবিবাবু যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সবই মিলে গেছে তাঁর আজকের বিদায়পর্বটির সঙ্গে।

'গিয়েছে আশ্বিন। পূজার ছুটির শেষ
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিস-পত্র দড়াদড়ি লয়ে—
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে, ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার—
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
এক দণ্ড-তরে। বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা।'

সত্যি, কী কী সব যে দিয়েছে রেনু বোঝা বেঁধে! মায় চুলকানির ওষুধ পর্যন্ত। নারকেল, সরষের তেল, পাটালি গুড়, গব্যঘৃত।

তারপর রেনুও হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছেন। মাও বলছেন 'ভালো থেইকো, বাবা', তখন হাসু, যে কথাই বলতে শেখেনি ভালোমতো, বলে উঠল, 'আব্বা যাবে না। আব্বা যাবে না।'

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শক্তি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধা ভরে
'যেতে আমি দিব না তোমায়!' চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে...

যেতে তবু দিতে হয়েছে হাসুকে।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

'কর্তা, হাওয়া ছেইড়েছে ভালো, পাল তুলে দিব।' সমীর মাঝি বলে। মুজিব সংবিৎ ফিরে পান। তাঁর চোখে জল। তিনি চশমা খুলে চোখ মোছেন। 'দাও, পাল তুলে দাও।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের আমতলায় বসে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি বলাবলি করে, দুই বছরের হাসু যেতে দিতে চায়নি তার আব্বাকে, আর সেই মেয়েটিকেই আর একটি মাত্র ছোট বোনসমেত একদিন বহন করে চলতে হবে পুরো পরিবারকে যেতে দেওয়ার বেদনার পাষাণভার। সে আজ থেকে ২৬ বছর পরে। তারপর তার বাকিটা জীবন। ●